মশ্‌হুর মোস্‌লেম সিরিজ—৬

সোলতান মাহ্‌মূদ

"No mother shall give birth to a second one like Mahmud."—Prince Masud

আবদুল কাদের বি-এ, বি-সি-এস্‌

দশ আনা

মূল্য—১০/০

প্রকাশক—এম্‌, ইদ্‌রীস
মোস্‌লেম পাব্লিশিং কন্‌সার্ণ,
২৫, ভবানী দত্তের লেন,
কলিকাতা

এপ্রিল, ১৯৩৭

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক
মাসপয়লা প্রেস,
১১৪।১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত

To

Mr. H. Tufnell Barrett, I. C. S.

—লেখকের অন্যান্য বই—

মোস্‌লেম-কীর্ত্তি

প্রবাসী—"অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।"
বাংলার বাণী—"সমস্তই দরদ দিয়া বর্ণিত, সুন্দর সুলিখিত ও চমৎকার হইয়াছে।...সরস কাহিনী...অপূর্ব্ব উপভোগ্য হইয়াই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।"—তিন খণ্ড, প্রতি খণ্ড (বাঁধাই) ১৲

মোস্‌লেম জাহান সিরিজ

—স্পেনের ইতিহাস—

আনন্দবাজার—"স্পেনে মুস্‌লিম জয়-পতাকা উড্ডীনের বিচিত্র কাহিনী পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিবে।...ইতিহাস-রসজ্ঞদের নিকট এই পুস্তক নিশ্চয়ই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিবে।" বাঁধাই, ১।০

—মূর-সভ্যতা—

স্পেনীয় মোসলমান সভ্যতার ও ইউরোপের উপর উহার আদর্শ প্রভাবের বিশদ বিবরণ। ৩৮৬ পৃষ্ঠা, ২৷৷০ (বাঁধাই)

মশ্‌হুর মোস্‌লেম সিরিজ

—উজীর আল্‌-মন্‌সূর—

হিতবাদী—"হিন্দু পাঠকগণের নিকটও আদর লাভ করিবে।" ৷৷৵০

—শের শাহ্‌—

মোহাম্মদী—"উপন্যাসের ন্যায় মনোরম।" বাঁধাই, দশ আনা।
হায়দর আলী ৷৷৵০, টিপু সোলতান ৷৷০, ছোটদের সালাহুদ্দীন ৷৷৵০, ইস্‌লাম ও পর্দ্দা ৷০, ইস্‌লাম ও বহু-বিবাহ ৷০, তুরস্কের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

দ্রষ্টব্য—সিরিজের 'স্থায়ী গ্রাহকে'র জন্য মূল্য শতকরা ২০৲ কম। প্রকাশিত পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়া এবং ভবিষ্যতে যে সকল পুস্তক বাহির হইবে, তাহা ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গ্রাহক হইতে হয়।

সূচী

কবির কল্পনা, সূফীর মরজি, গল্প-লেখকের খোশ্‌-খেয়াল ও স্থূলদর্শী ঐতিহাসিকের অন্ধ অনুকরণের ফলে সোলতান মাহ্‌মুদের ন্যায় আর কাহারও চরিত্র সম্ভবতঃ এত বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার প্রকৃত চিত্র অঙ্কণের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত। সর্ব্ব-সাধারণের মনে তাঁহার সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, ইহা পাঠে তাহা বিদূরিত হইতে দেখিলে শ্রম সফল মনে করিব।

আবদুল কাদের

সোলতান মাহ্মূদ

পূর্ব্বাভাস

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর কথা। মোস্লেম জগত তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। খেলাফৎ ত্রিধা বিভক্ত; স্পেনে উমায়্যা ও মিসরে ফাতেমিয়া খলীফারা সর্ব্বেসর্ব্বা; বাগ্দাদের অমিত-প্রতাপ আব্বাসিয়ারা অপরের ক্রীড়নক। য়েমন পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন ছিল। ৯৭৯ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়াও স্বাধীনতা অবলম্বন করে। প্রায় একই সময় ফাতেমিয়ারা সিরিয়া কাড়িয়া লন; মোসেল ও দিয়ার বকরেও স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠে।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা ছিল পারস্যের। আব্বাসিয়াদের তখন আর সে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল না। ফলে দূরবর্ত্তী দেশগুলি যেমন তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া যায়, পারস্যও তেমনি অসংখ্য খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে ইস্মাঈল সামানি প্রতিষ্ঠিত খোরাসান সর্ব্বপ্রধান। দশম-শতাব্দীর প্রথমে শির দরিয়া (জাক্সার্টেস্) হইতে বাগ্দাদ এবং খ্বারিজম ও কাস্পিয়ান সাগর হইতে ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে সামানিয়াদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। বুখারা তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

বুয়াইহিয়ারা পশ্চিম পারস্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। রুকুনুদ্দৌলা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৯৩৩ খৃঃ)। রাই নগর তাঁহাদের রাজধানী

ছিল। কালক্রমে ইরাক বুয়াইহিয়াদের হস্তগত হয়; পরিশেষে এমন কি খাস বাগ্দাদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। খলীফাকে হেরেমে পুরিয়া রাখিয়া তাঁহারা নিজেরাই 'শান্তি-নগরী'র শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এতদ্ব্যতীত দশম শতাব্দীর প্রথমাংশের পর তাবারিস্তানে একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। জুর্জ্জনিয়াহ্, খ্বারিজম, গর্ষিস্তান ও জুজানন নামতঃ বুখারার অধীন ছিল। দশম শতাব্দীর শেষে সামানিয়ারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা যথা-স্থানে উল্লিখিত হইবে। এ সকল রাজ্যের রাজারা নিরন্তর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও তাঁহারা নামতঃ বাগ্দাদের খলীফার অধীনতা স্বীকার করিতেন।

রাজ-নীতির ন্যায় ধর্ম্ম-নীতিতেও অনৈক্য দেখা দেয়। এক দল মোসলমান প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসন পছন্দ করিত না। তাহাদের মতে নবী-বংশধরেরাই খেলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এই রাজনৈতিক মত-বিরোধ পরিণামে ধর্ম্ম-নৈতিক বিবাদরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। নবী-বংশ বা আলী-বংশের সমর্থন-কারীরা শিয়া (দল) ও অন্যান্য মোসলমান সুন্নী নামে পরিচিত হয়। পারস্য অদ্যাপি শিয়াদের লীলা-ভূমি। ক্রমে তাহাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়; কার্ম্মাথিয়ারা ও বাতেনি বা ইস্মাঈলিয়ারা হজরত আলী ও তাঁহার বংশধরগণকে খোদার অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে। তাহারা সুন্নীদিগকে

মোসলমান বলিয়াও মনে করিত না। কার্ম্মাথের অনুচরেরা মদ্য পান ও নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিত। হজ্জ-যাত্রীরা তাহাদের হস্তে নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠিত ও নিহত হইত। মক্কা আক্রমণ করিয়া তাহারা ত্রিশ হাজার লোককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করে।* পক্ষান্তরে শত শত সুন্নী ইস্‌মাঈলিয়াদের নিযুক্ত ফেদায়ী বা গুপ্তচরদের হাতে প্রাণ দেয়। কাজেই শিয়া-সুন্নীর বিবাদ ক্রমশঃ অতি প্রবল আকার ধারণ করে।

ইস্‌মাঈলিয়ারা মিসরে ফাতেমিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। এশিয়ায় শিয়ারা দেমাস্কের উমায়্যা বংশ ধ্বংস করিলেও আলী-বংশীয়েরা খেলাফৎ পান নাই। তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া আব্বাসিয়ারা বাগ্দাদে সুন্নী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের দরুণ শিক্ষা-সভ্যতার উৎকর্ষের প্রবল প্রতিবন্ধক ঘটে; রাজ্য-বিস্তার ও ধর্ম্ম-প্রচার দুই-ই যুগপৎ বন্ধ হইয়া যায়। উমায়্যাদের পরে কোন উল্লেখ-যোগ্য স্থান মোসলমানদের হস্তগত হয় নাই, কোন নূতন জনপদে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে নাই।

দশম শতাব্দীর শেষে এক পুরুষ-সিংহের আবির্ভাবে এই শোচনীয় অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিনি শিয়া-প্রধান পারস্যে সুন্নী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহার বীরত্বে ছিন্ন-ভিন্ন পারস্য আবার একত্র হয়; অসংখ্য খণ্ড-রাজ্য যেন যাদু-মন্ত্র-

---

* Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire, vol. vi, 55-7.

বলে অন্তর্হিত হইয়া যায়; অখ্যাত গজনা নগর প্রাচ্যের শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়; একতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া মোসলমানেরা আবার নব উৎসাহে নূতন রাজ্য জয়ে বহির্গত হয়। যাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দৃশ্যতঃ এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভবপর করিয়া তোলে, তাঁহারই নাম সোলতান মাহ্‌মুদ। গজনা হইতে তদীয় বংশ ইতিহাসে গজনভী বলিয়া বিখ্যাত।

———

গজনা রাজ্য

ইস্‌লাম সাম্য-বাদী ধর্ম্ম ; মোস্‌লেম জগতে সামাজিক বা রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্তি বা বংশ বিশেষের মৌরশী সম্পত্তি নহে। প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকিলে ক্রীতদাসেরাও সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারে। ভারতের দাস-রাজ-বংশ ইতিহাস-বিখ্যাত। মিসরের অমিততেজা মামলূক সোলতানেরা ক্রীতদাস ছিলেন। গজনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও এক জন ক্রীতদাস ; তাঁহার নাম আলপ্তিগিন। তিনি ইস্‌মাঈল সামানির পুত্র আহ্‌মদের দেহ-রক্ষক ছিলেন। নসর বিন্ আহ্‌মদ তাঁহাকে স্বাধীনতা দেন ; নূহ বিন্ নসরের রাজত্বে তিনি কয়েক জন সৈন্যের সর্দ্দার নিযুক্ত হন। নূহের মৃত্যুর পর বালক-রাজা আবদুল মালেকের আমলে আলপ্তিগিন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। নবীন ভূপতি প্রথমে তাঁহাকে বল্‌খের শাসনকর্ত্তা ও পরে খোরাসানের সেনাপতি নিযুক্ত করেন (৯৬১ খৃঃ)।

যে বৎসর আলপ্তিগিন খোরাসান গমন করেন, সে বৎসরের শেষেই নিষ্পাপ আবদুল মালেক স্বর্গগত হন। আলপ্তিগিন তাঁহার না-বালেগ পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইতোমধ্যে বুখারার সৈন্যেরা বিগত আমীরের ভ্রাতা মনস্থরকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। আলপ্তিগিন অস্ত্রবলে প্রভু-পুত্রের স্বার্থ-রক্ষায় অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু স্বীয় অনুচরদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাইয়া পরিশেষে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যত্র ভাগ্য

পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। মন্‌সূর তাঁহার বিরুদ্ধে বার হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আলপ্তিগিন গজনা যাত্রা করিলেন। শাসনকর্ত্তা আবু বকর লায়ক তাঁহার হস্তে পরাভূত হইলেন। চারি মাস অবরোধের পর রাজধানী তাঁহার হাতে আসিলে তিনি নিজকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (৯৬২ খৃঃ)।

এত দূরে আসিয়াও আলপ্তিগিন মন্‌সূরের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন না। তিনি তাঁহাকে শায়েস্তা করার জন্য পুনরায় বিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা শোচনীয়রূপে পর্য্যুদস্ত হইলে মন্‌সূরের মাথা ঠাণ্ডা হইল। তিনি আলপ্তিগিনকে গজনার শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু নবীন ভূপতি দীর্ঘকাল তাঁহার পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিলেন না। বাস্ত ও কাবুল রাজ্যের কিয়দংশ জয়ের পর ৯৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষে পরলোক হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল।

আলপ্তিগিনের পুত্র ইব্রাহীমের সহিত আবু বকর লায়কের পুত্র আবু আলী লায়কের সঙ্ঘর্ষ বাধে। প্রথমে পরাজিত ও রাজ্য-হারা হইলেও এক বৎসর পরে মন্‌সূরের সাহায্যে তাঁহার জয়লাভ ঘটে।

ইব্রাহীমের কোন উপযুক্ত সন্তান না থাকায় ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বিলকাতিগিন নামক আলপ্তিগিনের জনৈক ক্রীতদাস রাজা নির্ব্বাচিত হন। এই ন্যায়বান নিষ্কলঙ্ক ভূপতির মৃত্যুর পর পিরিতিগিন নামক আলপ্তিগিনের আর এক জন ক্রীতদাস

গজ্‌নার সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৭৪ খৃঃ)। তাঁহার কুশাসনে উত্যক্ত হইয়া প্রজারা আবু আলী লায়ককে গজনা আক্রমণে প্ররোচিত করে। কিন্তু তিনি আলপ্তিগিনের অন্যতম ক্রীতদাস ও জামাতা সুবুক্তিগিনের হস্তে পরাভূত হন। তখন আমীরেরা পিরিতিগিনকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া সুবুক্তিগিনের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেন (এপ্রিল ২০, ৯৭৭ খৃঃ)। তিনিই বিখ্যাত গজনভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা; বিশ্রুতনামা সোলতান মাহ্‌মুদ তাঁহারই পুত্র।

এশিয়ার ফিলিপ

সুবুক্তিগিনের পিতা জাক তুর্কিস্তানের এক ক্ষুদ্র জনপদের সর্দার ছিলেন। বার বৎসরের সময় শত্রুরা তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া নসর হাজীর নিকট বিক্রয় করে। খুব সম্ভবতঃ এই সময় তিনি ইস্‌লামে দীক্ষিত হন। হাজীর নিকট হইতে আলপ্তিগিন তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লন। নূতন মনীবের অধীনে সুবুক্তিগিনের বখ্‌ত খুলিয়া যায়। ইব্রাহীমের চেষ্টায় প্রভু-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাজকুমারী লাভের কয়েক বৎসর পরে বখ্‌তগুণে রাজ-তখ্‌তও তাঁহার হাতে আসে।

সিংহাসনে বসিয়াই সুবুক্তিগিন রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। দুই বৎসর পরে বাস্ত ও কাস্‌দর বা বর্ত্তমান বেলুচিস্তান তাঁহার দখলে আসিল। অতঃপর হিন্দুস্তানের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল।

রাজা জয়পাল তখন লমগান হইতে চন্দ্রভাগা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদের অধিপতি। সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার সহিত সুবুক্তিগিনের প্রথম সঙ্ঘর্ষ বাধিল। তিনি তাঁহার কয়েকটী দুর্গ অধিকার করিয়া লইলে জয়পাল স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হইয়া এক বিরাট বাহিনী লইয়া তাঁহাকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন। সুবুক্তিগিনও আবার বখ্‌ত পরীক্ষার জন্য সদলবলে গজনা ত্যাগ করিলেন। গুজক পাহাড়ের নিকট দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতীয়েরা বীরের জাতি। তাহারা যথেষ্ট বীরত্ব

দেখাইল। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সহসা তুষারপাত আরম্ভ হওয়ায় তাহারা ভয় পাইয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিল। কথা হইল, সুবুক্তিগিন ক্ষতিপূরণ বাবদে দশ লক্ষ দেরহাম (।৶০ আনা) ও পঞ্চাশটী হস্তী পাইবেন; এতদ্ব্যতীত জয়পাল তাঁহাকে সীমান্তে কয়েকটী দুর্গ ও শহর ছাড়িয়া দিবেন।

রাজা যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতেন, তবে হয়ত ভারতের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিত। কিন্তু তিনি নিজের অসাধুতায় জাতীয় বিপদ টানিয়া আনিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া জয়পাল কেবল যে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন, এমন নহে; সুবুক্তিগিনের যে সকল দূত টাকা নিতে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেও ধরিয়া নিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অচিরেই তাঁহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইল। সুবুক্তিগিন ইহা নীরবে হজম করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে শত্রু-রাজ্যে আপতিত হইলেন। অনতিবিলম্বে লমগানের কয়েকটী শহর তাঁহার দখলে আসিল। একা সুবুক্তিগিনের সম্মুখীন হইতে জয়পালের সাহস হইল না। তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বজাতি-বৎসল ভারতীয় রাজারা তাঁহার আকুল আহ্বানে যথেষ্ট সাড়া দিলেন। দিল্লী, আজমীড়, কনৌজ ও কালঞ্জর হইতে অর্থ ও সৈন্য সাহায্য আসিল। এক লক্ষ অশ্বারোহী ও অগণিত পদাতিক লইয়া জয়পাল পুনরায়

সুবুক্তিগিনের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু প্রবল যুদ্ধের পর তাঁহার সৈন্যেরা সিন্ধুর দিকে পলাইয়া গেল। লমগান ও পেশওয়ারের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র জনপদ সুবুক্তিগিনের রাজ্য-ভুক্ত হইল। পেশওয়ার রক্ষার্থ দুই হাজার সৈন্য রাখিয়া তিনি বিজয়ী-বেশে গজনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বার তের বৎসর পরে সুবুক্তিগিনের সম্মুখে এক বিরাটতর দিগ্বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। খোরাসানের শাসনকর্ত্তা আবু আলী ও ফায়ক নামক জনৈক আমীর একযোগে সামানিয়া ভূপতি নূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিপন্ন আমীর গজনা-পতির নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। স্বীয় পুত্র মাহ্মুদের বীরত্বে সুবুক্তিগিন হেরাতের নিকট বিদ্রোহীদের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। কৃতজ্ঞ ভূপতি তাঁহাকে নাসিরুদ্দীন ওদ্দৌলা উপাধি ও বল্খের শাসন-ভার প্রদান করিলেন। মাহ্মুদ সায়ফুদ্দৌলা উপাধি ও খোরাসানের সেনাপতির পদ পাইলেন।

মাহ্মুদ নিশাপুরে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই ফায়ক ও আবু আলী তাঁহাকে হেরাতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিলেন। সংবাদ পাইয়াই সুবুক্তিগিন পুত্রের সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন। তুসের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহী নেতারা নূহের সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমীর তাঁহাদের সাধুতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। আবু আলী বুখারায় গেলে তিনি তাঁহাকে ধৃত করিয়া সুবুক্তিগিনের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এদিকে ফায়ক তুর্কিস্তানের অধিপতি ইলাক খাঁর নিকট

পলাইয়া গেলেন। তাঁহার প্ররোচনায় খাঁ বুখারা আক্রমণে অগ্রসর হইলে নূহ্ আবার সুবুক্তিগিনের সাহায্য চাহিলেন; কিন্তু উজীরের কুপরামর্শে তিনি তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে যোগদান করিতে অনুমতি দিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সুবুক্তিগিন কাত্ওয়ানের পূর্ব্ব দিকস্থ সমগ্র সামানিয়া রাজ্য ইলাক খাঁকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করিলেন। পক্ষান্তরে মাহ্মূদ বিশ হাজার সৈন্য লইয়া বুখারার দিকে অগ্রসর হইলে ভীত আমীর তাঁহার উজীরকে বিতাড়িত করিয়া সুবুক্তিগিনের মনোনীত ব্যক্তিকে উজীরী দিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই আবু আলীর মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা আবুল কাসেম অগ্রজের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া নিশাপুর দখল করিলেন। কিন্তু মাহ্মূদ ও তাঁহার খুল্লতাত নিকটবর্ত্তী হইলেই তিনি শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সামানিয়া রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবুক্তিগিন বল্খ গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার এক ভগিনী ও কতিপয় আত্মীয়ের মৃত্যু হইল। মনোকষ্টে তাঁহার নিজেরই অসুখ হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি গজনায় চলিলেন। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল।

সুবুক্তিগিন অত্যন্ত জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভক্তি করিত। বৃহত্তর বিপক্ষ বাহিনীর উপর বারংবার জয়লাভই তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও গঠন-শক্তির প্রমাণ। তাঁহার স্নেহ-পরায়ণতা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

'সুবুক্তিগিন ও হরিণীর গল্প' তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। ন্যায়-বিচারের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে এক-বাক্যে আমীর-ই-আদিল বা ন্যায়বান আমীর উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

আমীর নূহের সহিত তাঁহার ব্যবহারও প্রশংসনীয়। তিনি বিপদে পড়িলেই সুবুক্তিগিন প্রভুর সাহায্যে ছুটিয়া যাইতেন। বিশ্বাসঘাতকতায় কখনও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। তিনি এক জন বড় রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। ফরিজুন বংশের জনৈক শাহ্‌জাদীর সহিত মাহ্‌মুদের বিবাহ দিয়া তিনি নিজের বংশ-গৌরব বৃদ্ধি করেন। নব-বধুর পরিবারের সহিত সামানিয়াদের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকায় এতদ্দ্বারা রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে, বৈদেশিক ভূপতিরা আগ্রহের সহিত তাঁহার বন্ধুতা কামনা করিতেন। *

প্রধানতঃ ভারতাক্রমণের জন্যই সুবুক্তিগিনের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত। দুর্ভাগ্য মোহাম্মদ বিন্ কাসেম ঠিক পথে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেন নাই। সিন্ধু দেশ অনুর্ব্বর বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর পৌণে তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন মোসলমান বিজেতা ভারত

---

* Dr. Nazim, Sultan Mahmud, 33. ডাক্তার সাহেবের গ্রন্থ হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আক্রমণে প্রলুব্ধ হন নাই। আর্য্য, শক, হুন, গ্রীক প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাচীনতর জাতিই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া এদেশে প্রবেশ করে। সুবুক্তিগিনও দেখাইয়া দেন যে, উহাই ভারতাক্রমণের সঠিক পথ। তিনি হিন্দুস্তানে মোসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ভাবী বিজয়ের পথ অনেকটা সুগম করিয়া যান। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই ভুবন-বিখ্যাত মাহ্‌মুদ ভারতে মোসলমান রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সুবুক্তিগিনই গজনা-রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার দিগ্বিজয়ের ফলে চতুর্দ্দিকে ইহার সুনাম বিস্তৃত হয়। উত্তরে আমুদরিয়া (অক্সাস), পশ্চিমে বর্ত্তমান পারস্যের পূর্ব্ব সীমান্ত, দক্ষিণে আরব সাগর ও পূর্ব্বে পেশওয়ার পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত পুত্রের আমলে তাহা আরও বিস্তৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়।* ফিলিপের ন্যায় তিনি মৃত্যুকালে পুত্রের জন্য একটী শান্তিপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ও এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিয়া যান। এই ধনবল ও জনবলের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার সুযোগ্য

---

* "Sabuktigin···firmly laid the foundation of the great empire which was to be extended and consolidated by his more famous son."—Cambridge History of India by Lt-colonel Sir Wolsely Haig, vol. iii, 12.

উত্তরাধিকারী আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও বিরাটতর আকারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। সুবুক্তিগিন এভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া না গেলে মাহ্মুদ পিতার অপূর্ণ স্বপ্ন কতদূর সফল করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা ভাবনার বিষয়। বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্যাবলীর সহিত মেসিডোনিয়ার ফিলিপের এত অধিক সাদৃশ্য আছে যে, তাঁহাকে ন্যায়তঃ এশিয়ার ফিলিপ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

গৃহ-যুদ্ধ

সুবুক্তিগিনের জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল কাসেম মাহ্‌মুদ ৯৭১ খৃষ্টাব্দের পহেলা নভেম্বর দিবাগত রাত্রে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার নবম পূর্ব্ব-পুরুষ পারস্যের শেষ সাসানিয়া ভূপতি এজদেগর্দ্দ, মাতা জাবুলিস্তানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। তজ্জন্য তিনি মাহ্‌মুদ-ই-জাবুলি বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রিগ্‌স সাহেব তাঁহাকে না-হক্‌ সুবুক্তিগিনের জারজ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বরাত দিতে পারেন নাই। ফেরদৌসীর তথা-কথিত এক ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে 'দাসী-পুত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অপবাদ সত্য হইলে দরবারের কবিরা তাঁহাকে মাহ্‌মুদ-ই-জাবুলি বলিয়া অভিনন্দিত করিতেন না। অধ্যাপক মাহ্‌মুদ খাঁ শিরানী বিখ্যাত 'উর্দ্দু' পত্রিকায় (১৯২১-৩) কয়েকটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই কবিতাটী একেবারে অপ্রামাণিক।

মাহমুদের বাল্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি অন্যান্য প্রাচ্য শাহ্‌জাদার ন্যায় হাদীস, ইস্‌লামী আইন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। সমগ্র কোরান তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সুবুক্তিগিন নিজে তাঁহাকে রাজনীতি শিক্ষা দেন। শাসন-কার্য্যে মাহ্‌মুদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বাস্ত জয়ে গমনকালে সুবুক্তিগিন তাঁহার উপর রাজধানী রক্ষার ভার

দিয়া যান; মাহ্মুদ তখন সাত বৎসরের বালক মাত্র। এই সময় বু-আলী কির্ম্মানি তাঁহার উজীর হিসাবে কাজ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি জমিন দাওয়ার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

মাহ্মুদ যুদ্ধ-বিদ্যাও অবহেলা করেন নাই। উৎকৃষ্ট তরবারি-চালক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন অভিযানে পিতার সঙ্গে থাকিয়া তিনি বিপুল সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। * গোর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে কৈশোরেই তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। জয়পালের সহিত যুদ্ধেও তাঁহার সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মাহ্মুদের বয়স তখন পনর বৎসর মাত্র।

ফায়ক ও আবু আলীর সহিত যুদ্ধে মাহ্মুদের শৌর্য্য-বীর্য্য সকলেরই প্রশংসার উদ্রেক করে। সামানিয়া ভূপতি তাঁহাকে উপাধি ও সেনাপতিত্ব দিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বিদ্রোহীরা দুই বার নিশাপুর হস্তগত করিলেও পরিণামে পর্য্যুদস্ত হয়। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া মাহ্মুদ খোরাসানে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় পিতার মৃত্যু হওয়ায় অচিরে তাঁহাকে গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হইতে হয়।

সুবুক্তিগিনের চারি পুত্র; তাঁহার মৃত্যুকালে ইউসুফ শিশু মাত্র। অপর তিন জনের মধ্যে মাহ্মুদ খোরাসানের ও নসর

---

* Marshman, History of India (1873), 20.

বাস্তের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মৃত্যুর সময় ইসমাঈল পিতার নিকটে থাকায় তিনি তাঁহাকে গজনা ও বল্‌খের শাসন-ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। গজনা রাজধানা বলিয়া অন্য ভ্রাতারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অধীন হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যেক বয়স্ক পুত্রকে কিছু রাজ্যাংশ দেওয়া মৃত ভূপতির ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাগের সময় তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পুত্রদের মধ্যে মাহ্‌মুদ জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতম। কাজেই সিংহাসন ন্যায়তঃ তাঁহারই প্রাপ্য। মাহ্‌মুদ যে ন্যূনতর যোগ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

কার্য্য-ক্ষেত্রেও হইল তাই। ভ্রাতৃ-বৎসল মাহ্‌মুদ ইস্‌মাঈলকে পিতৃ-রাজ্যের অংশে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন না। কিন্তু তিনি নিজের দাবী ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হইলেন না। পিতার মৃত্যুর পরই ইস্‌মাঈল দূত মারফতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক পত্র পাইলেন। মাহ্‌মুদ লিখিলেন, "ভাই, সিংহাসনে তোমার অপেক্ষা আমার দাবী বেশী; তথাপি যুদ্ধ ও শাসন-কার্য্যে তোমার অভিজ্ঞতা থাকিলে আমি পিতার অন্তিম ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম না। যোগ্যতা নাই বলিয়া তুমি রাজধানী রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ। এমতাবস্থায় তুমি আমার দাবী স্বীকার করিয়া আমাকে গজনা ছাড়িয়া দিলে আমি তোমাকে বল্‌খ বা খোরাসান অর্পণ করিতে রাজী আছি।"

বলা বাহুল্য, হাতে পাইয়া ইস্‌মাঈল স্বভাবতঃই সিংহাসন

ছাড়িতে চাহিলেন না। মাহ্মূদের শ্বশুর জুজাননের রাজা আবুল হারিস্ মীমাংসার চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিরুপায় হইয়া মাহ্মূদ অস্ত্র-বলে বিবাদ মিটাইবার জন্য গজনা যাত্রা করিলেন। হেরাতে পৌঁছিয়া তিনি আবার আপোষ মীমাংসার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু ইস্মাঈল এবারও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

অগত্যা মাহ্মূদ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। শ্বশুর, ভ্রাতা নসর ও খুল্লতাত (হেরাতের শাসনকর্ত্তা) বুগরাজুক তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে মাহ্মূদ আবার নিষ্পত্তির প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইস্মাঈল ইহাকে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া এবারও মিলনের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন।

কবি ও পণ্ডিত বলিয়া নবীন ভূপতির খ্যাতি থাকিলেও তাঁহার সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না। পক্ষান্তরে মাহ্মূদের রণ-নৈপুণ্য সর্ব্বজন-বিদিত। সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল না। ৯৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গজনা প্রান্তরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সন্ধ্যার সময় মাহ্মূদ ভীম বিক্রমে শত্রু বাহিনীর উপর আপতিত হইলে তাহারা রণ-ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। ইস্মাঈল প্রথমে দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া শেষে ভ্রাতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন। মাহ্মূদ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না। ইস্মাঈলকে নামতঃ বন্দী করিলেও তিনি তাঁহার পদোচিত সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু হৃত-সর্ব্বস্ব ভূপতি এই

বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। পর বৎসর তিনি ভ্রাতৃ-হত্যার জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইহার সন্ধান পাইয়া মাহমুদ তাঁহাকে জুজাননে শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে আমরণ নজর-বন্দী থাকিয়া তিনি শান্তিতে দেহত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা লাভ

যে বৎসর সুবুক্তিগিন মারা গেলেন, আমীর নূহ্ও সেবার দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার পুত্র মন্সূর বুখারার গদী পাইলেন। মাহ্মুদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নূতন আমীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মন্সূর বল্খ, হেরাত প্রভৃতি রাজ্যে তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লইলেন। গোল বাধিল খোরাসান লইয়া। গৃহ-যুদ্ধের সময় মন্সূর বেগতাজান নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর উহার শাসন-ভার অর্পণ করেন। কাজেই তিনি এখন উহা মাহ্মুদকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিবাদে কোনই ফল হইল না। মন্সূর কিছুতেই তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম রদ করিতে রাজী হইলেন না।

মাহ্মুদ এই স্পষ্ট অন্যায় বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি অস্ত্রবলে খোরাসান পুনরধিকারে যাত্রা করিলেন। নিশাপুরের নিকটে পৌছিলে বেগতাজান শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিনারক্তপাতে রাজধানী মাহ্মুদের হস্তগত হইল। ইতোমধ্যে মন্সূর স্বয়ং বেগতাজানের সাহায্যে আসিলেন। মাহ্মুদ সামানিয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া নেমকহারাম সাজিতে চাহিলেন না। মন্সূরের আগমনে তিনি নিশাপুর ছাড়িয়া মার্ভরুদে প্রস্থান করিলেন। খোরাসানের রাজধানী আবার বিনা বাধায় বেগতাজানের হাতে আসিল।

ইতোমধ্যে ফায়ক ও বেগতাজানের সন্দেহ হইল, মাহ্মুদের

প্রতি মনস্থরের সহানুভূতি আছে। তাঁহারা তাহাকে বন্দী করিয়া বিগত আমীরের ভ্রাতা আবদুল মালেককে সিংহাসনে বসাইলেন। মাহ্‌মুদ পদচ্যুত ভূপতির পক্ষাবলম্বন করিয়া নেমকহারামদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে মার্ভের নিকট ফায়ক, বেগতাজান, আবদুল মালেক ও আবুল কাসেমের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। মাহ্‌মুদ নিজ সৈন্যদলের কেন্দ্রভাগ পরিচালনা করিলেন। তাঁহার বীরত্বে পরাজিত হইয়া আব্দুল মালেক বুখারায় পলাইয়া গেলেন। বেগতাজান জুর্জ্জনে আশ্রয় লইলেন। মাহ্‌মুদের সৈন্যেরা তাঁহাকেও বুখারায় তাড়াইয়া দিল। ইতোমধ্যে আবুল কাসেম কুহিস্তানে জাঁকিয়া বসিলেন। তুসের নব-নিযুক্ত শাসন-কর্ত্তা আরসলান যাদেব প্রভুর আদেশে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। আবুল কাসেম পরাজিত হইয়া তাবাসে পলাইয়া গেলেন।

এইরূপে খোরাসান পুনরায় মাহ্‌মুদের দখলে আসিল। নসর ইহার সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। বিজয়-বার্ত্তা লইয়া বাগ্দাদে দূত ছুটিল। খলীফা অল্‌-কাদির বিল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমীনুদ্দৌলাহ্‌ ও আমীনুল মিল্লাহ্‌ উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাকে বিজিত রাজ্যের রাজ-ক্ষমতা প্রদান করিয়া যথা-রীতি সনদ পাঠাইয়া দিলেন। মাহ্‌মুদ নিজকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া সোলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। রাজা অর্থে আরবীতে সোলতান শব্দ

ব্যবহৃত হইলেও তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন মোসলমান এই উপাধি গ্রহণ করেন নাই। *

এই সনদের গুরুত্ব অত্যধিক। ইতঃপূর্ব্বে গজনীর অধিপতিরা সামানিয়াদের অধীন ছিলেন। সনদ প্রাপ্তির ফলে সে অধীনতা ঘুচিয়া গেল। এখন হইতে তিনি স্বাধীন নরপতির পর্য্যায়ে উন্নীত হইলেন। খলীফার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

ইতোমধ্যে সামানিয়া রাজ্যের মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ইলাক খাঁ সহসা বুখারার উপর আপতিত হইয়া আবদুল মালেক ও অন্যান্য শাহ্‌জাদাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে প্রায় দেড় শ' বৎসর পরে বিখ্যাত সামানিয়া বংশের রাজত্বের শেষ হইল।

বুখারা ইলাক খাঁর হস্তগত হইলে মাহ্‌মুদ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। আমূ দরিয়া উভয় রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। এই মিত্রতা দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে মহা ধূমধামে ইলাক খাঁর কন্যার সহিত মাহ্‌মুদের বিবাহ হইয়া গেল। উভয় রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় তাতারদের মধ্যে ইস্‌লাম বিস্তারের সুযোগ ঘটিল। †

---

* Elphinstone, History of India, 317.

† Habib, Sultan Mahumd, 21.

শান্তির কণ্টক

বুখারার পতন এবং খাঁ পরিবারের সহিত সন্ধি ও বিবাহের ফলে দৃশ্যতঃ খোরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু আশা মায়া-মরীচিকা। মাহ্‌মুদ স্থানান্তরে গমন করিতে না করিতেই খোরাসানে আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

প্রথম বিপদ আসিল বিলুপ্ত-প্রায় সামানিয়া বংশ হইতে। তাঁহারা মরিবার পূর্ব্বে এক বার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িলেন না। মোস্তান্‌সির নামক আমীর নূহের এক পুত্র হাজত হইতে পলাইয়া গিয়া একে একে দুই বার নসরকে নিশাপুর হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। দুই বারেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জুর্জ্জনে পলাইয়া গেলেন। সামানিয়া শাহ্‌জাদা হুয়ায়ুনের ন্যায় দুর্জ্জয় সাহস ও অধ্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন। বারংবার পরাজিত হইয়াও তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন না। জুর্জ্জন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সারাকৃস্ অধিকার করিলেন। নসর তাঁহাকে পরাভূত ও আবুল কাসেমকে বন্দীকৃত করিয়া গজনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অদম্য মোস্তান্‌সির প্রথমে ট্রান্স-ওক্সিয়ানা (মাওরুন্‌-নাহার) ও পরে বুখারায় ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোথাও সুবিধা করিতে না পারিয়া পুনরায় খোরাসানে উপস্থিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ অশান্তি সৃষ্টিতে বিরক্ত হইয়া মাহ্‌মুদ তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মোস্তান্‌সির প্রথমে জুর্জ্জনে পলাইয়া গেলেন; পরে নাসায় ফিরিয়া আসিয়া আবার

বুখারা অধিকারের চেষ্টা পাইলেন। অসীম সাহসের অধিকারী হইলেও ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূল ছিল ; শেষ সামানিয়া শাহ্‌জাদার পতন-কাহিনী পারস্য-সম্রাট দারার মৃত্যু-বিবরণের ন্যায়ই করুণ ও হৃদয়-বিদারক। তিনি গুজ মরুভূমিতে পলাইয়া গিয়া ইব্‌নে বুহাজি নামক এক আরব সর্দ্দারের নিকট আশ্রয় লইলেন। এই বিশ্বাসঘাতক আতিথ্য-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তথাকার আমিলের প্ররোচনায় হতভাগ্য যুবককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল।

দারা-হন্তার ন্যায় এই বিশ্বাস-ঘাতকেরাও সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি পাইল। ন্যায়বান মাহ্‌মূদ এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদের দুই জনের প্রতিই মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা জারি করিলেন। তাঁহার আদেশে আরব শিবিরও লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইল।

সামানিয়া বংশ বিলুপ্ত হইলেও খোরাসানে শান্তি আসিল না। এই বার যিনি অশান্তির সৃষ্টি করিলেন, তিনি স্বয়ং মাহ্‌মূদের শ্বশুর ইলাক খাঁ। খোরাসানের উপর তাঁহার লুব্ধ-দৃষ্টি ছিল। কন্যার খাতিরে তাহা সঙ্কুচিত হইল না। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মূদ মুলতানে গেলে ইলাক খাঁর সেনাপতি চাগার্তিগিণ ও সুবাশ্‌তিগিণ বল্‌খ ও হেরাত অধিকার করিয়া লইলেন। সংবাদ পাইয়া সোলতান বিদ্যুদ্‌গতিতে হিন্দুকুশ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বল্‌খের দিকে ছুটিলেন। তাঁহার আগমনে চাগার্তিগিন বুখারা ছাড়িয়া ভয়ে তির্মিদে পলাইয়া গেলেন। সোলতানের আদেশে আরস্‌লান যাদেব সুবাশ্‌তিগিনের অনুসরণ করিলেন। তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে জুর্জ্জনে আশ্রয় লইলেন। সেখানে সমস্ত

বোঝা-পত্র রাখিয়া মার্ভের দিকে রওয়ানা হইলে সোলতানের সৈন্যেরা মরুভূমিতে তাঁহাকে শোচনীয়রূপে পরাভূত করিল।

ইতোমধ্যে চাগার্তিগিণ ইলাক খাঁর নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য পাইয়া বল্‌থ অধিকারে আনিলেন। সুবাশ্‌তিগিনের পরাজয়ের পর মাহ্‌মুদ তাঁহাকে শিক্ষা দানে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়াই চাগার্তিগিন বুখারায় পলাইয়া গেলেন। ১০০৬ খৃষ্টাব্দের শেষে সমগ্র খোরাসান আবার মাহ্‌মুদের হাতে আসিল।

এই অকৃতকার্য্যতার পরেও ইলাক খাঁর শিক্ষা হইল না। ১০০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে তিনি কাশগড়ের রাজা কাদির খাঁর সহায়তায় অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য লইয়া বল্‌খের নিকট পুনরায় জামাতার উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সোলতানের সৈন্যেরা প্রমাদ গণিল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া কায়মনোপ্রাণে খোদাতা'লার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ভক্তের আরজ সম্ভবতঃ কবুল হইল। মাহ্‌মুদের ধর্ম্ম-প্রাণতায় সৈন্যেরা তাহাদের লুপ্ত সাহস ফিরিয়া পাইল। শৈল-শৃঙ্গ হইতে নামিয়া আসিয়া তিনি ভীমবেগে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ শত হস্তী ছিল। উহাদের পদতলে পিষ্ট হইয়া শত্রুরা আতঙ্কে পলাইয়া গেল। বহু লোক ধরা পড়িল, সহস্র সহস্র সৈন্য আমু দরিয়ার জলে ডুবিয়া মরিল। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল।

দেশে ফিরিয়া গিয়া ইলাক খা এই অপমান ঘুচাইবার জন্য

কাদির খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা আহ্মদ তুগানের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহ এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায় তাঁহার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। মাহ্মূদের শান্তির কণ্টক চিরতরে উৎপাটিত হইল।

ইলাক খাঁর উত্তরাধিকারী আরস্লান খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য বুখারা-রাজ আলিতিগিনের ভ্রাতা তুগান খাঁর হস্তগত হইল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তি-বৃদ্ধিতে মাহ্মূদের মনে খোরাসানের নিরাপদতা সম্বন্ধে আশঙ্কা জন্মিল। আলিতিগিনের নিকট সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি এক তরণী-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দ্রুতপদে আমু দরিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বুখারা-পতি তখন সমরকন্দে। মাহ্মূদ নিকটে আসিলে তিনি বিনাযুদ্ধে শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হাতে ধরা পড়িল। মাহ্মূদ তাঁহাদের প্রতি পদোচিত সম্মান দেখাইলেন। *

পর বৎসর (১০২৫ খৃঃ) কাদির খাঁ সমরকন্দে আসিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার পুত্র বুগ্রা খাঁর সহিত মাহ্মূদের কন্যার ও সোলতানের পুত্র মোহাম্মদের সহিত কাদির খাঁর কন্যার বিবাহ হইল। শুভ-পরিণয়ের পর মাহমূদ বৈবাহিককে সমরকন্দ ছাড়িয়া দিয়া গজনায় চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের এই মিত্রতা আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। কাজেই খোরাসানের জন্য মাহ্মূদকে আর মাথা ঘামাইতে হয় নাই।

---

* "The Sultan treated them with the respect and consideration due to their position."—Nazim, 54.

মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য-বিস্তার

৯৯৫ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ যখন খোরাসান জয় করেন, তখন তিনি গর্ষিস্তানের রাজা আবু নসরকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে আহ্বান করিয়া পাঠান। এই রাজ্য বর্ত্তমান বাদ্গেস্ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তথাকার রাজার উপাধি শার। তিনি সামানিয়াদের অধীন ছিলেন।

আবু নসর মাহ্মুদের আদেশ মান্য করিয়া স্বরাজ্যে তাঁহার নামে খোৎবা পাঠের হুকুম দেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ এক অভিযানে সোলতানের সহগমন করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হন। তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য আল্তুন্তাশ, আরস্লান যাদেব ও মার্ভরুদের শাসনকর্ত্তা আবুল হাসান (গর্ষিস্তানের রাজধানী) আফ্শিনে উপস্থিত হইলেন। আবু নসর বশ্যতা স্বীকার করিলেন; কিন্তু মোহাম্মদ এক দুর্গম পার্ব্বত্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব কোনই কাজে আসিল না। সোলতানের সৈন্যেরা দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মোহাম্মদকে বন্দী করত (বেলুচিস্তানের অন্তর্গত) মাসাঙ্গে পাঠাইয়া দিল। ১০১২ খৃষ্টাব্দে গর্ষিস্তান গজনা-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। আবুল হাসান নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

সোলতান আবু নসরকে গজনায় লইয়া গেলেন। তাঁহাকে

দরবারে একটী উচ্চপদ প্রদত্ত হইল ; এতদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয়ও তিনিই পাইতেন। সোলতান ও তাঁহার উজীর আহ্‌মদ বিন্ হাসান তাঁহাকে আমরণ (১০১৬) খুব সম্মান করিয়া চলিতেন।

৯৯৫ খৃষ্টাব্দে জুর্জ্জনিয়াহ্ বা বর্ত্তমান উরগঞ্জের রাজা মামুন খ্বারিজম প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন। এই রাজ্যটী আরব সাগরের দক্ষিণে ও কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। মামুনের উত্তরাধিকারী আলীর সহিত সোলতান মাহ্‌মুদের ভগিনী কাহ্-কালিজির বিবাহ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আবুল আব্বাস বিধবা ভ্রাতৃ-জায়ার পাণিপীড়ন করেন (১০০৯ খৃঃ)।

নূতন শাহ্ মাহ্‌মুদকে খুব ভক্তি করিতেন। কিন্তু সোলতান তাঁহাকে স্বনামে খোৎবা পড়িবার আদেশ দিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তুর্কিস্তানের খাঁদের সাহায্য লাভের প্রয়াস পাইলেন। এই সংবাদ মাহ্‌মুদের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক লক্ষ সৈন্য ও পাঁচ শত হস্তী লইয়া বুখারার দিকে অগ্রসর হইলেন। ভয় পাইয়া আবুল আব্বাস তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার নামে খোৎবা পড়িবার হুকুম জারি করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মাহ্‌মুদ গজনায় চলিয়া গেলেন।

এই বশ্যতা স্বীকারের ফলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও আবুল আব্বাস ভাগ্য-লিপি এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার ভীরুতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া বসিল। দুর্ভাগ্য ভূপতি তাহাদের হাতে প্রাণ দিলেন (মার্চ্চ, ১০১৭খৃঃ)।

তাঁহার এক বালক-পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বিদ্রোহী দলপতি আলপ্তিগিন খ্বারিজমে ভীতির রাজ্য স্থাপন করিলেন।

স্বীয় ভগিনীপতি ও করদ নৃপতির এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া মাহ্মূদের ক্রোধের সীমা রহিল না। কিন্তু ভগিনীর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই আত্ম-সংবরণ করিতে হইল। তাঁহার কূট-নীতিতে তুর্কিস্তানের খাঁরা নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হইলেন। অতঃপর মাহ্মূদ এক বিরাট বাহিনী লইয়া খ্বারিজম যাত্রা করিলেন। বল্খে পৌছিলে বিদ্রোহীরা বৃথাই সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা পাইল। মাহ্মূদ এত কঠোর শর্ত্ত দাবী করিলেন যে, শান্তির কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেল।

তির্মিদে গিয়া সোলতান সসৈন্যে নৌকাযোগে আমু দরিয়ার পথে খ্বারিজমে পৌছিয়া উরগঞ্জ যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যেরা বিদ্রোহী সেনাপতি খুমার তাশের হস্তে শোচনীয়রূপে পরাভূত হইল; কিন্তু সোলতানের দেহরক্ষীরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করত তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইল। পর দিন আলপ্তিগিন স্বয়ং অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে নামিলেন। ঘোর সংগ্রামের পর তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। মাহ্মূদ বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া ভীষণ প্রতিশোধ আদায় করিলেন। বালক-রাজা ও মামুনিয়া বংশের বহু লোক বন্দীকৃত হইলেন। আলপ্তিগিন ও তাঁহার সঙ্গীরা ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত বা হস্তী-পদতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন (জুলাই, ১০১৭)।

মাহ্মূদ আল্তুনতাশকে খ্বারিজম শাহ্ উপাধি দিয়া নব-

বিজিত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া গজনায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই আবুল আব্বাসের শ্বশুর আবু এস্হাক খ্বারিজমের পরাধীনতা-নিগড় ভগ্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু আল্তুনতাশ আরস্লান যাদেবের সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। ইহার পর খ্বারিজমে আর কোন অশান্তি দেখা দেয় নাই।

আমু দরিয়ার উত্তরেও মাহ্মূদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। তুর্কিস্তানের খাঁদের সহিত সংগ্রামকালে সাময়িকভাবে সমরকন্দ তাঁহার হাতে আসে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্ভবতঃ এই সময় তির্মিদের উত্তর-পশ্চিমস্থ সাগানিয়া ও পূর্ব্বদিকস্থ ক্বুবাদিয়া ও খুৎলান নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিরাও মাহ্মূদের অধীনতা স্বীকার করেন।

গোর ও বেলুচিস্তান জয়

কাসদর রাজ্য বর্ত্তমান বেলুচিস্তানের উত্তর-পূর্ব্ব অর্দ্ধেক লইয়া গঠিত ছিল। তথাকার রাজা গজনার অধীন ছিলেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে তিনি করদান বন্ধ করিলে মাহ্‌মুদ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজাকে বাধ্য হইয়া বার্ষিক কর ব্যতীত পনরটী হস্তী ও দেড় কোটী দেরহাম ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি করিতে হইল।

হেরাতের পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য জনপদের নাম গোর। মান্দেশ বা পূর্ব্ব গোরের রাজা ইব্‌নে সুরী সুবুক্তিগিনকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লন। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি নিয়মিতভাবে কর দান বন্ধ করিয়া দেন। কয়েকটী ছোটখাট যুদ্ধের পর ১০১১ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। গোরীরা গ্রাম ছাড়িয়া আক্রমণ-কারীদিগকে বাধা দিতে ছুটিয়া আসিল। আল্‌তুন্‌তাশ তাহাদের হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু মাহ্‌মুদ তাহাদিগকে কয়েকটী যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। অহঙ্গরাণের নিকট উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। কিছুতেই গোরীদিগকে হটাইতে না পারিয়া মাহ্‌মুদ প্রত্যাবর্ত্তনের ভাণ করিলেন। তিনি পলায়ন করিতেছেন মনে করিয়া শত্রুরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি সহসা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। বিশৃঙ্খল গোরীরা বিপুল রসদ-পত্র ফেলিয়া পলাইয়া গেল। অনেক বড় কর্ম্মচারীসহ স্বয়ং ইব্‌নে সুরী ধরা পড়িলেন। সোলতান

তাঁহার পুত্রকে সিংহাসন দিয়া তাঁহাকে গজনায় চালান দিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনচেতা বীর-পুরুষ পথিমধ্যে বিষ পানে কারা-যন্ত্রণার অপমান হইতে চির-মুক্তি লাভ করিলেন।

চারি বৎসর পরে দক্ষিণ-পশ্চিম গোর মাহ্মূদের দখলে আসিল। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি গজনা ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলের দস্যুদিগকে খুব শায়েস্তা করিয়া পর বৎসর শাহ্জাদা মস্ঊদকে তাব বা উত্তর-পশ্চিম গোর জয়ে প্রেরণ করিলেন। সীমান্তে পৌঁছিলে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব্ব গোরের সর্দ্দারেরা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। বার্ত্তার, রাজান ও অন্যান্য গিরি-দুর্গ হস্তগত করিয়া মস্ঊদ সদলবলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিলেন। রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলে রাজা ভীত হইয়া সোলতানকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লইলেন।

এই বৎসর আর একটী ক্ষুদ্র জনপদ মাহ্মূদের হস্তগত হয়। নূর ও কিরাত নদীর উপত্যকা-বাসীরা শাক্য সিংহের পূজা করিত। এই স্থান দুইটী বর্ত্তমান কাফিরিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। মাহ্মূদের লোকেরা দুর্গম জনপদের মধ্য দিয়া সৈন্য চলাচলের জন্য পথ প্রস্তুত করিলে কিরাত উপত্যকার রাজা ইস্লাম গ্রহণ ও করদানে সম্মত হইলেন। সদাশয় সোলতান তাঁহাকে স্বপদে বহাল রাখিয়া কোষাধ্যক্ষ আলীকে নূর নদীর উপত্যকার দিকে প্রেরণ করিলেন। অধিবাসীরা বাধা দান করিয়া পরাজিত হইল। নব-দীক্ষিতদের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য আলেম নিযুক্ত করিয়া এবং আলীর অধীনে এক দল সৈন্য রাখিয়া সোলতান গজনায় ফিরিয়া আসিলেন।

পারস্য জয়

সামানিয়া সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে সিস্তানের শাসনকর্ত্তা খালাফ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সুবুক্তিগিনের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। গৃহ-যুদ্ধের সময় বুগরাজুক মাহ্মুদের সাহায্যে গমন করিলে খালাফ তাঁহার পুত্র তাহেরকে পাঠাইয়া দিয়া কুশাঞ্জ প্রদেশ দখল করিয়া লন (৯৯৮ খৃঃ)।

সিংহাসনে বসিয়া মাহ্মুদ খুল্লতাতকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধ জয় করিয়া মদ-মত্ত হইলে তাহের তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে মাহ্মুদ স্বয়ং রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। খালাফ ইস্পাহ্বুদ দুর্গে আশ্রয় লইলে শত্রু সৈন্যেরা তাহা অবরোধ করিল। এক লক্ষ দিনার ক্ষতিপূরণ দিয়া তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

কিছু দিন পরে খালাফ তাহেরের সহিত ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করাইলেন। ইহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মাহ্মুদকে রাজ-দণ্ড গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া সিস্তানে উপস্থিত হইলেন। খালাফ সপ্ত-প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য তাক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সোলতানের সৈন্যেরা গভীর ও বিস্তৃত পরিখা অতিক্রম করিয়া সিংহ-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহারা বহিঃদুর্গ আক্রমণ করিলে খালাফ ভীত হইয়া

মাহ্মুদের পদতলে পতিত হইলেন। সদাশয় সোলতান তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি সহ তাঁহাকে জুজাননে পাঠাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ইলাক খাঁর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাঁহাকে গার্দিজে স্থানান্তরিত করা হয়। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সোলতান তৎপুত্র আবু হাফ্সকে মৃত রাজার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করেন। *

সিস্তান জয়ের কয়েক মাস পরে সেখানে এক ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মাহ্মুদের আগমনে বিদ্রোহীরা আ'ক দুর্গে আশ্রয় লইল। ইহার পতনের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। সোলতান নসরকে সিস্তানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গজনায় চলিয়া গেলেন (১০০৩ খৃঃ)।

জুর্জ্জন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব তটে ও তাবারিস্তান (বর্ত্তমান গিলান ও মাজেন্দারান) ইহার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১০১১ খৃষ্টাব্দে সৈন্যেরা তাহাদের রাজা কাবুসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপুত্র মেনুচেহরের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিল। তাঁহার অপর ভ্রাতা দারা গজনায় পলাইয়া গিয়া মাহ্মুদের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া মেনুচেহর সোলতানকে বার্ষিক অর্দ্ধলক্ষ দেরহাম কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অল্পকাল পরেই প্রভুর এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

---

* Nizam, 69.

১০২৯ খৃষ্টাব্দে রাই রাজ্য মাহ্‌মুদের পদানত হইলে মেনুচেহরের ভয় হইল, সোলতান হয়ত তাঁহার রাজ্যও আক্রমণ করিতে পারেন। ভাবী বিপদ নিবারণের জন্য তিনি গজনার রাস্তা বন্ধ, সমস্ত সেতু ভগ্ন ও চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ উৎসন্ন করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মাহ্‌মুদ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ত্বরিত গতিতে জুর্জ্জনে উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় জামাতা পাঁচ লক্ষ দিনার ক্ষতিপূরণ দিয়া শ্বশুরের নিকট ক্ষমা পাইলেন। কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

মাক্‌রাণ রাজ্য ওমান উপসাগর হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল এবং কির্ম্মান ও বেলুচিস্তানের কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। রাজা মাদান প্রথমে বুওয়াইহিয়াদিগকে কর দান করিতেন। পরে তিনি গজনার অধীনতা স্বীকার করেন। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিলে কনিষ্ঠ পুত্র পরাজিত হইয়া মাহ্‌মুদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ইহাতে ভীত হইয়া অপর ভ্রাতা ঈসা সোলতানকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া গজনায় এক দল দূত পাঠাইয়া দিলেন (১০২৬ খৃঃ)। তিন বৎসর পরে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে শিক্ষা দানের পূর্ব্বেই মাহ্‌মুদের মৃত্যু হইল।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে রাই বা পশ্চিম পারস্যের বুওয়াইহিয়া ভূপতি ফখ্‌রুদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মজ্‌দুদ্দৌলা সিংহাসনে বসিলেন। তিনি নয় বৎসরের বালক মাত্র বলিয়া রাজ-মাতা সাইয়েদা প্রতিনিধিরূপে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। না-বালেগ

রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষমতা হস্তগত করিতে চাহিলে, তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইলেও রাজকার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব রহিল না।

১০২৮ খৃষ্টাব্দে সাইয়েদার মৃত্যু হইলে চির-শিশু মজ্‌দুদ্দৌলা সৈন্যদিগকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। বিপন্ন ভূপতি মাহ্‌মুদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাইর প্রতি অনেক দিন হইতেই তাঁহার লুব্ধ-দৃষ্টি ছিল; কেবল রমণীর হাতে রাজ-দণ্ড ছিল বলিয়াই তিনি এতকাল চুপ করিয়াছিলেন। সোলতান হাজিব আলীকে তৎক্ষণাৎ আট হাজার সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিয়া অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বয়ং জুর্জ্জন সীমান্তে পাহারা দানে গমন করিলেন। মজ্‌দুদ্দৌলা সরল প্রাণে আলীকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে নিজ শিবিরে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন। সংবাদ পাইয়া মাহ্‌মুদ দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। দশ লক্ষ দিনার, পাঁচ লক্ষ দিনারের অলঙ্কার, ছয় হাজার পরিচ্ছদ ও অসংখ্য স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্র তাঁহার হস্তগত হইল। দুর্ভাগ্য মজ্‌দুদ্দৌলা সপুত্রক ভারতে প্রেরিত হইলেন। পরে সোলতান মসউদ তাঁহাদিগকে গজনায় ফিরাইয়া নেন। তিনি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতেন।

রাই দখলের পর মাহ্‌মুদ কার্ম্মাথিয়া, ইস্‌মাঈলিয়া ও মুতাজালিয়াদের খোঁজে লাগিয়া গেলেন। হাজার হাজার লোক

নিহত বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাদের গৃহে খানাতালাসি করিয়া সোলতান ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পুস্তকগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; নির্দ্দোষ গ্রন্থগুলি গজনায় প্রেরিত হইল।

সোলতান কিছু দিন সেখানে থাকিয়া শাসন-সৌকর্য্যের সু-ব্যবস্থা করিলেন। শাহ্‌জাদা মস্‌উদ রাইর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে নিকটবর্ত্তী জনপদের রাজারা সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আসিলেন। জঞ্জন, শাহ্‌রাজুর (কুর্দ্দিস্তানে) প্রভৃতি স্থানের অধিপতি ইব্রাহীম সালার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করায় তাঁহাকে শায়েস্তা করার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। প্রেরিত বাহিনী কাজবিল দখলে আনিল। কিন্তু মাহ্‌মুদ গজনায় ফিরিয়া গেলে সালার উহা পুনরধিকার করিয়া লইলেন।

পিতার আদেশে মস্‌উদ সালারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ইব্রাহীম সুদৃঢ় সারজাহান দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সোলতানের সৈন্যেরা উহা অবরোধ করিল; কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে কয়েক জন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে দুর্গের দুর্ব্বল অংশ দেখাইয়া দিলে অগত্যা সালার বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ দান করিলেন; কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। তাঁহার পুত্র কর দানে সম্মত হইয়া সোলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (১০২৯ খৃঃ)।

অতঃপর মস্‌উদ হামাদান ও ইস্পাহান জয়ে বহির্গত হইলেন। প্রথম যুদ্ধেই হামাদান তাঁহার দখলে আসিল। আলাউদ্দৌলাহ্‌ তুস্তরে পলাইয়া গেলেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে তাহাও মস্‌উদের

হস্তগত হইল। হৃত-সর্ব্বস্ব রাজা খলীফার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে শাহ্জাদা বার্ষিক বিশ হাজার দিনার কর দানের অঙ্গীকারে আলাউদ্দৌলাহ্কে ইস্পাহানের শাসন-কার্য্যে বহাল রাখিলেন।

ভারতাভিযান

সোলতান মাহ্‌মুদ কেবল পারস্য, আফগানিস্তান , বেলুচিস্তান ও মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষও আক্রমণ করেন। তাঁহার ঐ সকল দিগ্বিজয়ের কথা অনেকেরই জানা নাই ; প্রধানতঃ ভারতাক্রমণের জন্যই তিনি আমাদের নিকট সুপরিচিত।

(১) ১০০০ খৃষ্টব্দে মাহ্‌মুদের বিখ্যাত ভারতাভিযান আরম্ভ হয়। সে বার তিনি কয়েকটী সীমান্ত দুর্গ অধিকার করিয়াই গজনায় চলিয়া যান।

(২) পর বৎসর মাহ্‌মুদ দশ পনর হাজার অশ্বারোহী লইয়া পেশওয়ারের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বার হাজার অশ্বারোহী, ত্রিশ হাজার পদাতিক ও তিন শত রণ-হস্তী সহ রাজা জয়পাল তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইল ; তিনি নিজে পনর জন পুত্র ও প্রপৌত্র সহ ধরা পড়িলেন। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল।

মাহ্‌মুদ নিষ্ঠুর ছিলেন না। আড়াই লক্ষ দিনার ও পঞ্চাশটী হস্তী ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করায় রাজা জয়পাল মুক্তি লাভ করিলেন। মাহ্‌মুদ নিকটবর্ত্তী জনপদ করতলগত করিয়া পর বৎসর গজনায় ফিরিয়া গেলেন।

দেশে আসিয়া জয়পাল নিজকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত মনে

করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ; তাঁহার পুত্র আনন্দ পাল পিতার সঙ্কুচিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

(৩) পরবর্ত্তী দুই বৎসর মাহ্‌মুদ সিস্তান জয়ে ব্যস্ত রহিলেন। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভাতিন্দার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা বাজি রায় তিন দিন পর্য্যন্ত মোসলমানদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত রাখিলেন। চতুর্থ দিনে মাহ্‌মুদ নিজে যুদ্ধে নামিলেন। রাজা পরাজিত হইয়া দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সোলতানের সৈন্যেরা বৃক্ষ ও প্রস্তর দ্বারা পরিখা ভরাট করিয়া ফেলিল। ভয় পাইয়া বাজি রায় অরণ্যে পলায়ন করিলেন। মোসলমানেরা তাঁহাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিল। স্বাধীন-চেতা রাজা নিজের বুকে খঞ্জর চালাইয়া দিয়া ভাবী অপমানের হাত এড়াইলেন।

বাজি রায়ের পতনের পর দুর্গ সহজেই আত্ম-সমর্পণ করিল। ভাতিন্দা রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া মাহ্‌মুদ দুই শত আশিটী হস্তী ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গজনা যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার বহু যোদ্ধা ও বোঝা-পত্র সিন্ধু-জলে ভাসিয়া গেল। বহু কষ্ট ভোগ করিয়া ১০০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

(৪) ভাতিন্দা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সম্ভবতঃ মুলতানের কার্ম্মাথিয়া ভূপতি দায়ূদ মাহ্‌মুদকে উত্যক্ত করেন। তজ্জন্য ১০০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাকে শাস্তিদানে বহির্গত হইলেন। আনন্দ পাল বৃথাই তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা পাইলেন। মাহ্‌মুদ

তাঁহাকে পরাজিত করিয়া চন্দ্রভাগা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। রাজা কাশ্মীরে পলায়ন করিলে মাহ্‌মুদ পুনরায় মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দায়ুদ সিন্ধু নদীর এক দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। সাত দিন অবরোধের পর তাঁহার রাজধানী সোলতানের হস্তগত হইল। বিশ লক্ষ দেরহাম জরিমানা দিয়া নাগরিকেরা রক্ষা পাইল। কিন্তু মাহ্‌মুদ কার্ম্মাথিয়াদের প্রতি কোনই দয়া দেখাইলেন না। সুন্নী (গোঁড়া) মত পরিত্যাগের অপরাধে শত শত লোক তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

মুলতান জয়ের পর মাহ্‌মুদ চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ করতলগত করিতে বাহির হইলেন; কিন্তু খোরাসান আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুতপদে গজনায় চলিয়া গেলেন।

(৫) জয়পালের জনৈক দৌহিত্র সুখ পাল বন্দী-দশায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া নওয়াশা শাহ্‌ নাম ধারণ করেন। স্বদেশ গমন কালে মাহ্‌মুদ তাঁহাকে মুলতানের শাসন-ভার দিয়া যান। ইলাক খাঁর সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিলে সুখ পাল স্বধর্ম্মে ফিরিয়া গিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (১০০৭)। এই সংবাদে মাহ্‌মুদ ইলাক খাঁর পরাজিত বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারীতে বিদ্যুদ্বেগে মুলতানে উপস্থিত হইলেন। সুখ পাল পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। সোলতানের লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। তিনি তাঁহার নিকট হইতে চারি লক্ষ দেরহাম জরিমানা আদায় করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

(৬) দিন দিন মাহ্‌মুদের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া

আনন্দ পাল প্রমাদ গণিলেন। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী রাজাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন। উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, কালঞ্জর ও আজমীড়ের রাজারা স্ব স্ব বাহিনী লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। হিন্দু মহিলারা নিজেদের গহনা-পত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ-সাহায্য পাঠাইলেন। মিত্র-শক্তি সদর্পে পেশওয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ পাইয়া মাহ্‌মূদ ভীষণ শীত উপেক্ষা করিয়া সিন্ধু নদী অতিক্রম করিলেন। ঐহন্দের প্রান্তরে তিনি মিত্র-শক্তির সাক্ষাৎ পাইলেন। বিরাট সৈন্য-সাগর দেখিয়া তাঁহার মনে ভয় হইল। শিবিরের চতুর্দ্দিকে এক পরিখা খনন করিয়া তিনি শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে ভারতীয়েরাও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া রহিল। প্রত্যহ নূতন সৈন্য আসিয়া হিন্দুদের দল পুষ্টি করিতে লাগিল। বিলম্বে জয়লাভ সুদূর-পরাহত বুঝিতে পারিয়া মাহ্‌মূদ যুদ্ধারম্ভের জন্য এক হাজার বর্ষাধারী পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিশ হাজার গক্কার পরিখা অতিক্রম করিয়া তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া পড়িল। নিমেষে তিন চারি হাজার মোসলমান তাহাদের হাতে শহীদ হইয়া গেল। সোলতান তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় সহসা আনন্দ পালের হস্তী আতশবাজিতে ভীত হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তিনি

বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন মনে করিয়া হিন্দু সৈন্যেরা তাঁহার পিছু ছুটিল। দুই দিন দুই রাত পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিয়া দুর্দ্ধর্ষ মাহ্‌মুদ নগরকোটে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের অভ্যন্তরে এক বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত ছিল। ইহার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। দুর্গ রক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত সৈন্য ছিল না। রাজপুতেরা যুদ্ধে গিয়াছিল। মাহ্‌মুদ এত দ্রুত আসিলেন যে, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তিন দিন বাধা দানের পর ব্রাহ্মণেরা দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। মাহ্‌মুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অপরিমিত অর্থ লাভ করিলেন। সাত লক্ষ দিনার, বিশ মণ রত্নালঙ্কার, দুই শত মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ, সাত শত মণ স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্র, দুই হাজার মণ অবিশুদ্ধ রৌপ্য, একটী রৌপ্য-গৃহ ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল।

এই বিজয়ের ফল অতি গুরুত্বপূর্ণ। জয়পাল বা আনন্দপাল একা সুবুক্তিগিন বা মাহ্‌মুদকে বাধা দিতে পারেন নাই। এবারে সকলেই বুঝিল, ভারতীয় রাজাদের সমবেত শক্তিও মাহ্‌মুদের গতিরোধে সমর্থ নহে। বস্তুতঃ ইহার পর হইতে ভারতে আর কোন উল্লেখ-যোগ্য রাজ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই।

পক্ষান্তরে নগরকোটের মন্দিরে আশাতীত অর্থ পাইয়া মাহ্‌মুদের ধারণা হইল, হিন্দু-মন্দিরে যত বিপুল বিভব সঞ্চিত আছে, কোন রাজার কোষাগারেও তাহা নাই। ফলে এই সময় হইতে তিনি অধিকাংশ অভিযানেই বড় বড় মন্দির লুণ্ঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

বিজিত নগরে নিজের কর্ম্মচারী রাখিয়া এবং নগরকোট হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ স্বীয় সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া ১০০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মাহ্‌মুদ গজনায় চলিয়া গেলেন।

(৭) নগরকোট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্প দিন পরে মাহ্‌মুদ বর্ত্তমান আল্‌ওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত নারায়ণপুরে এক অভিযান পরিচালনা করিলেন। রাজা পরাজিত ও তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত হইল। কিছু দিন পরে তিনি সোলতানকে বার্ষিক কর ও পঞ্চাশটী হস্তী দান এবং দুই হাজার সৈন্য সাহায্যের অঙ্গীকার করিয়া এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। বিনিময়ে মাহ্‌মুদ ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৮) ১০১০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল গোর জয়ে অতিবাহিত করিয়া শীতকালে মাহ্‌মুদ মুলতান যাত্রা করিলেন। রাজ্য সহজেই তাঁহার হস্তগত হইল, শত সহস্র কার্ম্মাথিয়া বিরুদ্ধ মতের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। দায়ূদ নিজে ধরা পড়িয়া গুরাক দুর্গে প্রেরিত হইলেন। সেখানে শান্তিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৯) মাহ্‌মুদ নগরকোট হইতে চলিয়া গেলে আনন্দপাল লবণ পর্ব্বতে স্বীয় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নন্দনায় রাজধানী স্থাপন করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ত্রিলোচন পাল পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। গর্ষিস্তান জয়ে ব্যস্ত

থাকায় মাহ্‌মুদ তাঁহার ক্ষমতা নাশের অবসর পাইলেন না। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বরফপাতের দরুণ পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর তিনি পুনরায় সদলবলে নন্দনা যাত্রা করিলেন। ত্রিলোচন পাল পুত্র ভীম পালের হস্তে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া সাহায্য লাভের জন্য কাশ্মীরে রওয়ানা হইলেন। ভীমকে ন্যায়তঃ নেদার বা নির্ভীক বলা হইত। তিনি মর্গলা গিরি-সঙ্কটে খাত কাটিয়া মাহ্‌মুদকে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল; তিনি সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্যেরা নন্দনায় আশ্রয় লইল। মাহ্‌মুদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। বেশী দিন আত্মরক্ষার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পরিশেষে সৈন্যেরা বিনাশর্ত্তে দ্বার খুলিয়া দিল। বহু হস্তী, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল।

এদিকে ত্রিলোচন পাল কাশ্মীর-বাহিনী লইয়া বিতস্তার উত্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। সেনাপতি তুঙ্গ প্রাণভয়ে স্বদেশে পলাইয়া গেলেন।

এই বিজয়ের সংবাদ দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত হইল। ফলে নিকটবর্ত্তী বহু রাজা সোলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন; তাঁহাদের অনেক প্রজা মোসলমান হইয়া গেল। নন্দনায় স্বীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আগষ্ট মাসে মাহ্‌মুদ গজনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১০) ১০১৪ খৃষ্টাব্দের * অক্টোবরে মাহ্মুদ থানেশ্বর জয়ে যাত্রা করিলেন। এখানে চক্রস্বামীর মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহা অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ-স্থানে পরিণত হয়। সংবাদ পাইয়া দেরার রাজা রাম এক বিরাট বাহিনী লইয়া শতদ্রু নদীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সোলতানের সৈন্যেরা আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে করিতে দুই ভাগে নদী অতিক্রমের চেষ্টা পাইল। হিন্দুরা সারা দিন তাহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিল ; কিন্তু সন্ধ্যাকালে মাহ্মুদ স্বয়ং তাহাদের উপর আপতিত হইলে তাহারা হস্তী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া সটান পলাইয়া গেল। যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও শত্রুদের অপেক্ষা মাহ্মুদেরই অধিক ক্ষতি হইল।

অতঃপর মাহ্মুদ বিনা বাধায় থানেশ্বর পৌঁছিলেন। রাজা দেব-মুর্ত্তির উপর আত্ম-রক্ষার ভার দিয়া পলাইয়া গেলেন। সোলতান মন্দির লুণ্ঠন করিয়া মুর্ত্তিটী গজনায় চালান দিলেন।

(১১) ত্রিলোচন পালের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কাশ্মীর-রাজ তাঁহার সাহায্য করেন। তজ্জন্য ১০১৫ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ তাঁহাকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য লোহকোট দুর্গ

---

* গার্দিজির মতে ১০১১-২ খৃষ্টাব্দে বা নন্দনা অভিযানের পূর্ব্বে। অধ্যাপক হবীব এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক ওৎবীর মতে নন্দনা অভিযানের পরে। ইব্নুল আসীরেরও এই মত। ডাক্তার নিজাম ও স্যার উল্সলী হ্যাগ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ভীষণ বরফপাতের মধ্যে এক মাস ব্যর্থ অবরোধ চালাইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন ; কিছু দূর গিয়া সৈন্যেরা পথ ভুলিয়া এক জলা-ভূমিতে উপস্থিত হইল। সেখানে বহু লোক মারা পড়িল। শীত ঋতুর বাকী কয়েক মাস পাঞ্জাবে কাটাইয়া পরবর্ত্তী মার্চ্চে তিনি রিক্তহস্তে গজনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১৩) পূর্ব্ব দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মাহ্‌মুদ উত্তরাঞ্চলে তাহা পূরণ করিয়া লইলেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত খ্বারিজম রাজ্য তাঁহার পদানত হইল। পর বৎসর তিনি কনৌজ জয়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সুনাম ও বীরত্ব-কাহিনী ইতঃপূর্ব্বেই ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। কাজেই সহজে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইল না। দক্ষিণ-কাশ্মীর গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত কালঞ্জরের রাজপুত্র জানকী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। ২রা ডিসেম্বর যমুনা অতিক্রম করিয়া মাহ্‌মুদ শীর্ষব দুর্গ অবরোধ করিলেন। রাজা পলাইয়া গেলেন, সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিল। ত্রিশটী হস্তী ও দশ লক্ষ দেরহাম সোলতানের হস্তগত হইল।

বুলন্দ শহরের রাজা হর দত্ত দশ সহস্র প্রজা সহ ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলেন। অবশেষে মহাবানে আসিয়া তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল। রাজা কুলচাঁদ এক গভীর অরণ্যে সৈন্য স্থাপন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ দান করিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিল। তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইল। তাহাদের কিয়দংশ

যমুনার জলে ডুবিয়া মরিল, অবশিষ্ট লোকদের অধিকাংশ নিহত ও বন্দীকৃত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কুলচাঁদ স্ত্রীকে নিহত করিয়া একই ছুরিকা নিজের বুকে চালাইয়া দিলেন। মূল্যবান দ্রব্য ব্যতীত ১৮৫টী হস্তী মাহ্মুদের হস্তগত হইল।

যমুনার অপর তীরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা। হিন্দু-সভ্যতার এই বিরাট কেন্দ্র প্রস্তর-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু মাহ্মুদ আসিলে সৈন্যেরা বিনা বাধায় দ্বার খুলিয়া দিল। নগরের মন্দিররাজি লুণ্ঠন করিয়া তিনি পাঁচটী স্বর্ণ-মূর্ত্তি, দুই শত রৌপ্য-মূর্ত্তি, একটী বিরাট নীলকান্ত মণি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। একটী মূর্ত্তিতে দুইটী পদ্মরাগ মণি ছিল; উহাদের মূল্য অর্দ্ধ লক্ষ দিনার।

মথুরা লুণ্ঠনের পর মাহ্মুদ কনৌজের দিকে চলিলেন। প্রতিহর বংশীয় রাজ্যপাল তখন সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। সোলতানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়াই তিনি রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। একই দিনে নগরের সাতটী দুর্গ তাঁহার দখলে আসিল। রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া মাহ্মুদ চিরাচরিত নিয়মে গজনায় ফিরিয়া চলিলেন।

পথিমধ্যে তিনি নিষ্কর্ম্মা রহিলেন না। সামান্য বাধা প্রাপ্তির পর মুঞ্জ দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। গভীর জঙ্গল ও পরিখা আসাইর রাজা চন্দল ভোরকে রক্ষা করিতে পারিল না। একে একে তাঁহার পাঁচটী দুর্গ সোলতানের দখলে আসিলে তিনি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। আরও উত্তরে গেলে শারওয়ার রাজা

চন্দর রায় তাঁহাকে বাধা দানে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা ভীম পালের পরামর্শে শেষ পর্য্যন্ত পলায়ন করাই সাব্যস্ত হইল। মাহ্‌মুদ রাজধানী অধিকার করিয়া পলাতক ভূপতির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পঞ্চাশ মাইল ছুটিয়া তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহার প্রিয় হস্তী ও ধন-সম্পদ মাহ্‌মুদের হস্তগত হইল।

এই অভিযানে সোলতান সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ দেরহাম ও ৩৫০টী হস্তী প্রাপ্ত হন। খলীফা এক খাস দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার বিজয়-বার্ত্তা পাঠ করেন। তিনি এত দ্রুত গমন করেন যে, মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে এই বিরাট দিগ্বিজয় শেষ হয়।

(১৩) মাহ্‌মুদের ভারত ত্যাগের পর কালঞ্জরের রাজা গন্দ গোয়ালিয়রের রাজার সাহায্যে রাজ্যপালকে নিহত করিয়া তৎপুত্র ত্রিলোচন পালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আনন্দ পালের পুত্র ত্রিলোচন পালকেও হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন।

এই সংবাদ পাইয়া ১০১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে মাহ্‌মুদ গন্দকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন। রামগঙ্গার নিকট তিনি (পাঞ্জাবের) ত্রিলোচন পালের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার প্রাণপণ বাধা উপেক্ষা করিয়া মোসলমানেরা মশকে ভর দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল। যুদ্ধে আহত হইয়া ত্রিলোচন পাল সসৈন্যে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিয়া মাহ্‌মুদ নিজ অংশেই ২৭০টী হস্তী ও দুই সন্দুক মণি-মুক্তা পাইলেন। কনৌজ ধ্বংসের পর রাজ্যপাল

বারিতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রিলোচন পালকে পরাজিত করিয়া মাহ্মুদ সেদিকে অগ্রসর হইলেন। রাজ্য-পালের পুত্র পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। নাগরিকেরাও তাঁহার পথ ধরিল। পরিত্যক্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া মাহ্মুদ কালঞ্জর যাত্রা করিলেন।

দেড় লক্ষাধিক সৈন্য ও ৬৪০টী হস্তী লইয়া গন্দ ইতঃপূর্ব্বেই বারির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে উভয় বাহিনীর সাক্ষাৎ হইল। শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে মাহ্মুদ কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করিয়া তিনি মনে কিছু বল পাইলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদের হস্তে গন্দের এক দল যোদ্ধা পরাজিত হওয়ায় তাঁহার লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। এদিকে সম্ভবতঃ খণ্ড-যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করাই স্থির করিলেন। সমস্ত বোঝাপত্র ফেলিয়া রাখিয়া তিনি সসৈন্যে নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শত্রু-শিবির লুণ্ঠন করিয়া মাহ্মুদ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাহাদের অনেকে ধৃত বা নিহত হইল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে গন্দের আশিটী হস্তী সোলতানের হাতে ধরা পড়িল।

(১৪) রামগঙ্গার যুদ্ধের পাল ত্রিলোচন পাল মাহ্মুদের সহিত সন্ধি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সাহায্য লাভের জন্য কালঞ্জর যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে স্বীয় অনুচরদের হস্তে নিহত হন (১০২১ খৃঃ)। তাঁহার পুত্র ভীমপাল আজমীড়ে পলাইয়া যান। ইতঃপূর্ব্বেই কাফিরিস্তান মাহ্মুদের হস্তগত হয়। এই সুযোগে

তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত স্থায়িভাবে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে তিনি কাশ্মীর অধিকারের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সুদৃঢ় লোহকোট এবারও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। ফলে তিনি কাশ্মীর জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব নিরুপদ্রবে গজনভী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। লাহোর ও অন্যান্য নগরে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত এবং প্রধান প্রধান স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ১০২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি গজনায় ফিরিয়া আসিলেন।

(১৫) গন্দ পলাইয়া যাওয়ায় বিগত অভিযানে মাহ্‌মুদ তাঁহাকে শায়েস্তা করিতে পারেন নাই। অধিক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গজনায় চলিয়া যান। ১০২২ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার তাঁহাকে শিক্ষা দানে বহির্গত হইলেন। গোয়ালিয়রের রাজা অর্জ্জুন গন্দকে কর দান করিতেন। তজ্জন্য পথিমধ্যে তাঁহার রাজ্য অবরুদ্ধ হইল। চার দিন অবরোধের পর রাজা ভীত হইয়া পঁয়ত্রিশটী হস্তী দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

গোয়ালিয়রের পর কালঞ্জরের পালা আসিল। মাহ্‌মুদ দুর্গ বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে খাদ্য আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। বিপদে পড়িয়া গন্দ তিন শত হস্তী ও বার্ষিক কর দানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। তিনি সোলতানের প্রশংসা করিয়া একটী সুন্দর হিন্দী কবিতা লিখিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মাহ্‌মুদ গন্দকে পনরটী দুর্গের শাসন-ভার অর্পণ করিলেন;

এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাকে খেলাত ও মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া নিকটবর্ত্তী জনপদের জনৈক রাজা স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(১৬) উত্তর ভারতের রাজশক্তি বিধ্বস্ত ও ধন-ভাণ্ডার করতলগত করিয়া মাহ্‌মুদ দক্ষিণ দিকে মনোনিবেশ করিলেন। সোমনাথের মন্দিরের সুখ্যাতি শুনিয়া গুজরাটের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল। ভারতীয় রাজারা দেব-সেবার জন্য দশ সহস্র গ্রাম দান করেন। সহস্র ব্রাহ্মণ এখানে দিবারাত্র পূজার্চ্চনা করিতেন। মন্দিরে ৫০০ সেবা-দাসী, ৩০০ গায়ক ও ৩০০ ক্ষৌরকার ছিল। অনেক রাজা দেবোদ্দেশে এখানে তাঁহাদের কন্যা পাঠাইতেন।

অতি প্রাচীন বলিয়া সোমনাথে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়। দুই শত মণ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে মন্দিরের ঘণ্টা ঝুলিত; মণি-মুক্তা ও অলঙ্কার-পত্রের ত কথাই নাই। সুতরাং ইহার প্রতি মাহ্‌মুদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

লোভনীয় হইলেও সোমনাথ আক্রমণ নিতান্ত বিপদ্‌-সঙ্কুল ছিল। মধ্যে ৩৫০ মাইল বিস্তীর্ণ জনহীন অত্যুষ্ণ বিশাল রাজপুতনা মরুভূমি। কিন্তু মাহ্‌মুদ প্রকৃতির নিকট হার মানিতে চাহিলেন না। ১০২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তিনি ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও শত শত পদাতিক লইয়া গজনা ত্যাগ করিলেন। মুলতানে পৌঁছিয়া প্রত্যেক সৈন্য জলের জন্য দুইটী উট সঙ্গে লইল। এই অকিঞ্চিৎকর সম্বল লইয়া মাহ্‌মুদ অজ্ঞাত মরুভূমিতে ঢুকিয়া পড়িলেন।

পথিমধ্যে সোলতান লোদোর্ভা দুর্গ হস্তগত করিলেন। এক মাস পরে তিনি গুজরাটের রাজধানী অন্‌হিল্বরায় উপস্থিত হইলেন। রাজা ভীমদেব কচ্চ দেশে পলাইয়া গেলেন। মাহ্‌মুদ নগর হইতে রসদ-পত্র সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। মুধেরায় বিশ হাজার ভারতীয় তাঁহার গতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিল। দেলভাদার লোকেরা তাঁহাকে বাধা না দেওয়ায় উহা অনায়াসে তাঁহার হাতে আসিল।

১০২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মাহ্‌মুদ সোমনাথে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা ঘোষণা করিলেন, অন্যান্য দেবতার অপমান করায় সোমনাথ তাঁহাকে ধ্বংসের জন্য সেখানে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু দুর্গাধ্যক্ষ দেবতার উপর এত অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরিলেন না। তিনি পলায়ন করাই অধিকতর নিরাপদ মনে করিলেন।

সে দিনই দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। ৭ই জানুয়ারী মোসলমানেরা প্রাচীরে উঠিয়া আজান দিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তাহারা সেখান হইতে বিতাড়িত হইল। পর দিন ভাগ্য মোসলমানদের প্রতি অধিকতর প্রসন্ন হইল। তাহারা দুর্গ-প্রাকার অধিকার করিয়া হিন্দুদিগকে মন্দিরের দ্বারে তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবিলম্বে সেখানে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দলে দলে হিন্দু দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভীমবেগে শত্রুদের উপর আপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কাতরতায় পাষাণ নড়িল না। অর্দ্ধ লক্ষ ভক্ত যুদ্ধে নিহত হইল; অবশিষ্ট লোকেরা পলাইতে গিয়া

জলে ডুবিয়া মরিল, কিংবা সমুদ্রোপকূলস্থ সোলতানের প্রহরীদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

মাহ্মুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। লুণ্ঠিত স্বর্ণ ও রত্নাদির মূল্য দুই কোটী দিনার। ভারতের কোন রাজার কোষাগারেই এত অর্থ ছিল না।

মাহ্মুদ এত দ্রুতগতিতে আসেন যে, নিকটবর্ত্তী রাজারা মন্দিরের সাহায্যে আসিতে পারেন নাই। তিনি এক পক্ষকাল সোমনাথে অবস্থান করেন। ইত্যবসরে আবুর রাজা পরম দেব তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-পথ রোধে অগ্রসর হইলেন। মাহ্মুদ ভুট্টার দেশে অনর্থক শক্তি ক্ষয় করিবার মত আহ্মক ছিলেন না। তিনি বৃথা সঙ্কট এড়াইবার জন্য কচ্চ ও সিন্ধুর ভিতর দিয়া গজনা যাত্রা করিলেন। কচ্চ ও কাথিওয়াড়ের মধ্যে উপস্থিত হইলে সমুদ্র-বাহু তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মাহ্মুদ ভাটার সময় সসৈন্যে জলে ঝাপাইয়া পড়িয়া নিরাপদে অপর তীরে উঠিলেন। ভীমদেব তখন কান্থকোটে। সংবাদ পাইয়া তিনি পুনরায় পলাইয়া গেলেন। তাঁহার দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া মাহ্মুদ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময় সোমনাথের জনৈক প্রতিহিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া এক জনহীন স্থানে লইয়া গেলেন। কয়েক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে মাহ্মুদ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধু দেশে উপস্থিত হইলেন।

মনসূরা বা প্রাচীন ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছিলে কার্ম্মাথিয়া রাজা খাফেফ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। মাহ্মুদ সিন্ধু-তীর অবলম্বন করিয়া

সম্মুখে চলিলেন। একে ত সমগ্র ভূভাগ অনুর্ব্বর ; তদুপরি পথিমধ্যে জাঠেরা তাঁহাকে খুব উত্যক্ত করিল। বহু সৈন্য ও ভারবাহী পশু হারাইয়া ২রা এপ্রিল মাহ্‌মুদ গজনায় ফিরিয়া আসিলেন।

মোসলমানেরা যে কয়টী সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক সমরাভিযান পরিচালনা করে, সোমনাথ আক্রমণ উহাদের অন্যতম। এলফিনষ্টোন বলেন, "৩৫০ মাইল বিস্তীর্ণ রাজপুতনা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া এমন কি মিত্ররাজ্যে গমন করাও একালে অতি কঠিন ; বিপক্ষ বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম ইহা অতিক্রম করা অসাধারণ কৌশল ও দুঃসাহসের কাজ।" *

এই বিজয়-বার্ত্তা অচিরে সমগ্র মোস্‌লেম জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খলীফা আনন্দিত হইয়া মাহ্‌মুদ, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতাকে উপাধি দানে সম্মানিত করিলেন। জগতের অনেক বড় বীরের ন্যায় সোলতান ক্রমে এক জন পৌরাণিক বীর-পুরুষে পরিণত হইয়া পড়িলেন। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল ; কিন্তু তৎফলে মাহ্‌মুদ অমর হইয়া গেলেন। †

যুগে যুগে মাহ্‌মুদের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে যাইয়া

---

* "To cross this with an army, even into a friendly country, would be an exceedingly difficult undertaking at the present day : to cross it for the first time with a chance of meeting a hostile army on the edge, required an extraordinary share of the skill, noless than enter-prise." —Elphinstone 326-7.

† Nazim, 120-1.

গ্রন্থকারেরা অনেক কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাজারের ইতিহাসে একটী অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কথিত আছে, মাহ্‌মুদ সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে সেবকেরা তাঁহাকে অনেক টাকা দিতে চাহেন। প্রত্যুত্তরে সোলতান বলেন, "আমি প্রতিমা-ভঙ্গকারীরূপে পরিচিত হইতে চাই, মূর্ত্তি-বিক্রেতা হিসাবে নহে।" এই বলিয়াই তিনি হস্তস্থিত গদার আঘাতে মূর্ত্তিটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন; তখন উহার ভিতর হইতে অনেক মণি-মুক্তা বাহির হইয়া পড়ে।

হাণ্টার সাহেব বলেন, "এক সময় লোকে গল্পটী খুব বেশী বিশ্বাস করিলেও বর্ত্তমান গবেষণার ফলে ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাহ্‌মুদের মূর্ত্তি ভাঙ্গার গোটা গল্পটাই অলীক। প্রতিমূর্ত্তিটী ভারতের বারটী শিবলিঙ্গের অন্যতম; ইহা বিরূপ প্রস্তর। ইহার নাসিকাই ছিল না; মাহ্‌মুদ তাহা ভাঙ্গিবেন কিরূপে? ইহার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা ছিল বা সেখানে ধন-রত্ন সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, এ কথাও কেহ এখন বিশ্বাস করেন না।"*

---

*"There was a story···once extensively believed, but now discovered to be untrue...the whole story about Mahmud and his breaking of the image is a fabrication. The image, one of the twelve lingas set up through India was a shapeless stone ; it had not a nose to be demolished ; nor is it now belived that it was hollow, or had the jewels stowed away within its interior."—Hunter, History of India, 93.

অধ্যাপক উইলসন বলেন, "প্রাথমিক মোসলমান লেখকেরা ইহার কোন অঙ্গ ভঙ্গের কথা বলেন না। প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন অঙ্গই ছিল না। উহার অভ্যন্তরে ধন-রত্ন পাওয়ার কথা ফিরিশ্‌তার সৃষ্টি। নিরেট ছিল বলিয়া সেখানে রত্নাদি থাকা অসম্ভব।"* লেনপুল সাহেবেরও ইহাই মত।

এই অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্তির কথা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। খলীফার নিকট লিখিত বিজয়-লিপিতেও ইহার উল্লেখ নাই। সোমনাথ সম্বন্ধে ফারুখীর সুদীর্ঘ কাসিদায় ইহার আভাস মাত্রও নাই। অধ্যাপক উইলসনের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবুল ফেদার গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর বিখ্যাত সূফী কবি শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তারও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মতে মূর্ত্তিটী অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করা হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী লেখকই ইহার কিছু না কিছু পরিবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। ফিরিস্‌তার হাতে ইহা চরম রূপ প্রাপ্ত হয়। ডাউ সাহেব তাঁহার ভ্রান্ত অনুবাদে ইহাতে আরও

---

* "The earlier Muhammedan writers say nothing of the mutilation of its features, for in fact, it had none ; nothing of the treasures it contained, which as it was solid, could not have been within it. Firista invents the hidden treasure...with quite as little warrant."—Elliot and Dowson, vol. ii, 476.

রং ফলাইয়া যান। তথা হইতে গল্পটী বাজারের ইতিহাসে আমদানী হয়। *

(১৭) পরবর্ত্তী মার্চ্চে মাহ্মুদ জাঠদিগকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন। স্থল-যুদ্ধে তিনি অজেয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এবার তিনি জল-যুদ্ধেও নিজকে অপরাজেয় বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহিলেন। তাঁহার আদেশে চৌদ্দ শত রণতরী নির্ম্মিত হইল। প্রতি নৌকায় বিশ জন ধনুর্দ্ধর উঠিল। জাঠেরা চারি হাজার † রণতরী লইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ দান করিল; কিন্তু প্রবল সংগ্রামের পর পরাজিত হইয়া স্থলপথে পলায়নের চেষ্টা পাইল। মাহ্মুদের সৈন্যেরা সেখান হইতে তাহাদিগকে নদীর দিকে বিতাড়িত করিয়া দিল। তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নদী মধ্যে এক দূরবর্ত্তী দ্বীপে রাখিয়া আসিয়াছিল। সোলতানের সৈন্যেরা সেখানে উপস্থিত হইয়া বহু লোককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া জুন মাসে মাহ্মুদ গজনায় ফিরিয়া গেলেন।

---

* Elphinstone, 328-9, Fote-note, 21.

† অনেক ঐতিহাসিক ইহা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন।

শেষ জীবন

'বিন্দু বিন্দু বারিপাতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।' মাহ্‌মুদের শরীর পাষাণে গঠিত হয় নাই। দৃঢ় হইলেও অবিশ্রান্ত যুদ্ধাভিযানের গুরুতর ক্লেশে ক্রমে ক্রমে উহা জীর্ণ হইয়া আসিল। সর্ব্বশেষ বার ভারতে যাইয়া সম্ভবতঃ তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। এই রোগ আরোগ্য না হওয়ায় পরিণামে তাঁহার ক্ষয়রোগ ও উদরাময় দেখা দেয়। দুই বৎসর পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিলেও মাহ্‌মুদ লোকের নিকট নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলেন না। চিকিৎসকদের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করিয়া তিনি রীতিমত রাজ-কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। চির-জয়ী সোলতান রোগের নিকটও মাথা নত করিতে চাহিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি যথারীতি দরবারে বসিতেন; লোকে তখনও প্রত্যহ দুই বার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত। শ্রম-সাধ্য যুদ্ধাভিযানও বা'দ যাইত না। অসুস্থ দেহেও তিনি সেলজুক দমনের জন্য খোরাসান গমনে কুণ্ঠিত হন নাই।

মাহ্‌মুদের ন্যায় সেলজুকেরাও তুর্ক। দলপতির নামানুসারে তাহারা এই নামে অভিহিত হয়। এই যাযাবরদের উৎপাতে অস্থির হইয়া ১০২৫ খৃষ্টাব্দে কাদির খাঁ তাহাদিগকে তুর্কিস্তান হইতে স্থানান্তরিত করার জন্য সোলতানকে অনুরোধ করেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজা ও সর্দ্দারদের ন্যায় সেলজুকের পুত্র ইস্‌রাঈলও এই সময় তাঁহার আনুগত্য স্বীকারের জন্য উপস্থিত হন। কথা প্রসঙ্গে তিনি নব-

প্রভুকে বলিলেন, দরকার হইলে তিনি তাঁহাকে দুই লক্ষ অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। ইহাতে ভীত হইয়া সোলতান সময় থাকিতে সেলজুকদের শক্তিনাশে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি ইস্রাঈলকে বন্দী করিয়া কালঞ্জরে পাঠাইয়া দিলেন। চারি হাজার সেলজুক পরিবার খোরাসানে স্থানান্তরিত হইল। আরস্লান যাদেব তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া মারিবার পরামর্শ দিলেন। সোলতান কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে রাজী হইলেন না।

পরিণামে আরস্লানের আশঙ্কাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। ক্রমে সেলজুকেরা শক্তি সংগ্রহ করিয়া ভীষণ অত্যাচারী হইয়া উঠিল। প্রভুর আদেশে আরস্লান তাহাদিগকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া মাহ্মূদকে অসুস্থ দেহেও গজনা ত্যাগ করিতে হইল (১০২৮)। তাঁহার সাহায্য পাইয়া আরস্লান সেলজুক দমনে সমর্থ হইলেন। তাহাদেব বহু লোক নিহত বা বন্দীকৃত হইল। অবশিষ্টেরা প্রথমে কির্ম্মান, পরে ইস্পাহান ও পরিশেষে বল্খান পর্ব্বত-মালায় পলাইয়া গেল। অদ্ভুত সত্বরতার সহিত নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া ইহারাই এগার বৎসর পরে সোলতান মস্উদের হাত হইতে পারস্য ও মধ্য-এশিয়া কাড়িয়া লয়। ভবিষ্যতের গর্ভে যাহাই থাকুক না, আপাততঃ মাহ্মূদেরই জয় হইল।

ইহাই রুগ্নদেহে তাঁহার একমাত্র যুদ্ধ-যাত্রা নহে। পর বৎসর তিনি রাই জয়ের সাহায্যার্থ উত্তর সীমান্তে গমন করেন। অবাধ্যতা

প্রদর্শন করায় সেই বৎসরই তিনি পুনরায় মেনুচেহরকে শাস্তি-দানে বহির্গত হন। দিন দিন দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও তাঁহার বার্ষিক রাজ্য-পর্য্যটন বন্ধ হয় নাই। ১০২৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি খোরাসানে ও শীতকাল বল্‌খে অতিবাহিত করেন। বল্‌খের আব্‌-হাওয়া তাঁহার সহ্য না হওয়ায় ১০৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি গজনায় ফিরিয়া আসিলেন।

এবার সত্যই মাহ্‌মুদের জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ক্রমশঃ তাঁহার রোগ-যাতনা বৃদ্ধি পাইল। ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় অশ্রান্ত মাহ্‌মুদ চির-শান্তিধামে গমন করিলেন। সে দিনই এশার নামাজের সময় ফিরোজি বাগানে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইল।

সোলতান মস্‌উদ পিতার কবরের উপর একটী মহাড়ম্বর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দানেরও ব্যবস্থা করেন। পরবর্ত্তীকালের সকলেই তাঁহার কবরগাহ্‌কে ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। এমন কি জাহান্‌শোজ (বিশ্ব-দাহকারী) আলাউদ্দীন গোরী পর্য্যন্ত গজনা দাহের সময় ইহা সযত্নে রক্ষা করেন। কিন্তু সোলতানের ভক্তেরা যুগে যুগে মুষ্টি মুষ্টি মাটী ও কাষ্ঠখণ্ড লইয়া যাওয়ায় কবরস্তানের ক্ষতি হইয়াছে। হালাগুর অসভ্য সৈন্যেরাও ইহার অনেক অনিষ্ট করে। লর্ড এলেনবরো সকলের উপর টেক্কা দেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি সোমনাথের মন্দির হইতে আনীত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ইহার দেবদারু কাঠের দ্বারগুলি ভারতে লইয়া যান।

তাঁহার কু-মন্ত্রিত উৎসাহই প্রধানতঃ একটী সুন্দর স্থাপত্য-কীর্ত্তি ধ্বংসের জন্য দায়ী। এই উপলক্ষ্যে মোসলমানদের সর্ব্বনাশকর ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক লর্ড মেকলে পার্লিয়ামেণ্টে এক জোর বক্তৃতা দেন। পরে প্রমাণিত হয় যে, আনীত দ্বার-গুলি সোমনাথের নহে।* ফার্গুশন সাহেব বলেন, "এই দ্বারগুলির খোদাই-কার্য্যের সহিত কায়রোর ইব্‌নে তুলুনের মস্‌জেদ ও অন্যান্য অট্টালিকার অনুরূপ কার্য্যের এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, এগুলি যে একই সময়ে নির্ম্মিত এতদ্দ্বারা কেবল তাহাই প্রমাণিত হয় না; এগুলি নির্ম্মাণ করিবার সময় মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের দুই প্রান্তের প্রসাধন-পদ্ধতি যে কত অনুরূপ ছিল, তাহাও সপ্রমাণ হইয়া যায়। সোমনাথের দ্বারগুলি চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু এগুলি স্থানীয় দেবদারু কাষ্ঠে নির্ম্মিত। তদুপরি সমসাময়িক বা যে কোন যুগের কোন হিন্দু মন্দিরের কোন কিছুর সহিতই ইহাদের প্রসাধন-পদ্ধতির আদৌ কোন সাদৃশ্য নাই। বস্তুতঃ এই দ্বারগুলি যেখানে পাওয়া যায়, এগুলি যে সে স্থানের জন্যই নির্ম্মিত, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই।" †

---

* "It has since been shown that the doors in question could not have been those of the Somnath temple."—Keene, History of India, vol. i, 36.

† "...the carved ornaments on them are so similar to those found at Cairo....of that age, as not only to prove that they are of the same date, but also to show how similar were the modes of decoration at

এখন উহা আগ্রা দুর্গে রক্ষিত আছে। দুঃখের বিষয়, এগুলি মহামতি সোলতানের সমাধিতে পুনঃস্থাপিত করার জন্য আফগান সরকার কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া দ্বারগুলি যথাস্থানে ফেরত পাঠাইয়া দিলে পূর্ব্ব ভুলের সংশোধন হইত, মহত্ত্বের পরিচয়ও পাওয়া যাইত।

গজনা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে রওজা-ই-সোলতান বা সোলতানের সমাধি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে অদ্যাপি মাহ্‌মূদের কবর-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও লোকে ইহা জেয়ারত করিতে গমন করে।

---

the two extremities of the Moslem Empire,...At the same time there is nothing in their style of ornamentation that at all resembles anything found in any Hindu temple, either of their age or at any other time. There is, in fact, no reason for doubting that these gates were made for the place where they were found."—Indian and Eastern Architecture, vol. iii, 496.

শাসন-নীতি

বর্ত্তমান কালের 'ডিক্টেটর'দের ন্যায় সোলতান মাহ্‌মুদ এক জন পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ভূপতি (Despot) ছিলেন। তাঁহার এক পরামর্শ-সভা ছিল সত্য, কিন্তু তিনি সভ্যদের মতামত গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলে রাজ্যের স্থায়িত্ব তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কাজেই মাহ্‌মুদ আরাম করিতে পারিতেন না। তাঁহার সমগ্র জীবন কঠোর অক্লান্ত শ্রমে ব্যয়িত হয়। তিনি স্বয়ং শাসন-কার্য্যের প্রত্যেকটী বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অপরাধীদিগকে শাস্তি দিতেন। বারংবার তিনি বিশাল সাম্রাজ্য পর্য্যটন করেন। তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির সন্ধান পাইয়া প্রাদেশিক কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অধিকতর মনোযোগী হইত। এইরূপে নিরন্তর কঠিন পরিশ্রম করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও উদ্ধত অভিজাতদিগকে সংযত রাখিতে সমর্থ হন।

অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য মাহ্‌মুদকে প্রধানতঃ মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হইত। লোক নির্ব্বাচনে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। তাঁহার মনোনীত লোকেরা পরিণামে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। মাহ্‌মুদের শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সৈনিকদের ন্যায়ই তুল্য সংযমী, সুদক্ষ ও পরিশ্রমী ছিলেন। *

---

* Habib, 67.

শাসন-নীতি

সরকারী চাকুরী জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া ছিল না। তবে পরিশ্রমী, সুশিক্ষিত ও সুচতুর বলিয়া পারসিকদেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইত। যোগ্যতাই নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। সামান্য কেরাণীও ক্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিত।

মাহ্‌মুদ স্বয়ং প্রধান সেনাপতি ও প্রধান বিচার-পতি ছিলেন। তিনি নিজে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেন; বড় বড় কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারাই নিযুক্ত হইত। রাজস্ব, সমর, সংবাদ, গার্হস্থ্য ও গুপ্তচর বিভাগের পরিচালনা-ভার এক এক জন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারাই নিম্ন-পদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন।

মন্ত্রী নিয়োগ-কালে তাঁহার সহিত সোলতানের এক চুক্তি-পত্র লিখিত হইত। তাহাতে উজীর যেমন প্রভুর আনুগত্যের অঙ্গীকার করিতেন, সোলতানও তেমনি তাঁহার কোন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া লিখিয়া দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আমিল নিযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারীকে সাহেব-ই-দেওয়ান বলা হইত। প্রজারা সাধারণতঃ নগদ টাকায় খাজানা আদায় করিত; কেহ ইচ্ছা করিলে শস্যাদিও দিতে পারিত। এই সকল শস্য ও পশু বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হইত। ভ্রমণকালে সোলতান তাহা নিজের ব্যবহারে লাগাইতেন বা দুর্ভিক্ষের সময় বিপন্নদের সাহায্যে ব্যয় করিতেন।

প্রদেশের ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রেরিত

হইত। প্রধান হিসাব-রক্ষক (Accountant-General) আয়-ব্যয়ের সমস্ত হিসাব রাখিতেন। অজন্মা বা শত্রুকর্তৃক দেশ লুন্ঠিত হইলে উজীর সাধারণতঃ খাজানা মাফ করিয়া দিতেন; প্রজারা তখন কৃষি-ঋণও পাইত। রাজস্ব-সম্পর্কে উজীরই দেশের প্রধান বিচার-পতি ছিলেন; কাজেই তাঁহাকে প্রত্যহ আদালতে বসিতে হইত।

উজীরের পদ অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল ছিল। তিনি যত উপযুক্ত ও প্রভুভক্ত হইতেন, সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীরেরা তত অধিক তাঁহার ধ্বংস কামনা করিতেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্র এড়াইয়া চলা সব সময় সোলতানের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কাজেই পরিণামে নির্য্যাতন-ভোগ উজীরের ভাগ্যে এক প্রকার স্থির-নিশ্চিত ছিল।

৯৯৫ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ মার্ভের সাহেব-ই-বারিদ ফজলকে তাঁহার মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রভুর সিংহাসন লাভের পর তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। সুশিক্ষিত না হইলেও শাসন-কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। তিনি অত্যন্ত সফলতার সহিত বর্দ্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বলপূর্ব্বক অর্থ আদায়ের অজুহাতে অভিযুক্ত হন। আত্মপক্ষ সমর্থন না করায় ক্রুদ্ধ হইয়া সোলতান তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দেন। সে বৎসরই বন্দী-দশায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাহ্‌মুদের দ্বিতীয় উজীর আহ্‌মদ বিন্ হাসান তাঁহার দুধ-ভাই ও সহপাঠী। উভয়ে একই সঙ্গে লালিত-পালিত হন। আহ্‌মদ এক জন বড় পণ্ডিত ছিলেন। শাসন-কার্য্যে তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতা

ছিল। সুখ্যাতিতে একমাত্র মাহ্‌মুদের পরেই তাঁহার স্থান। তাঁহার ন্যায় এক জন দৃঢ়-হস্ত মন্ত্রীর সাহায্য না পাইলে সোলতানের পক্ষে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হওয়া কঠিন হইত। তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তিতে ঈর্ষ্যান্বিত ও দৃঢ় শাসনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধস্তন কর্ম্মচারীরা তদ্বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে। ফলে ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হইয়া কালঞ্জর দুর্গে প্রেরিত হন। পিতার মৃত্যুর পর মস্‌উদ তাঁহাকে আনাইয়া নিয়া পুনরায় উজীর নিযুক্ত করেন।

মাহ্‌মুদের পরবর্ত্তী উজীর আবু আলী হাসান বা হাসনক আবাল্য তাঁহার চাকুরী করেন। তিনি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ফাতেমিয়া খলীফা জহীর তাঁহাকে একটী খেলাত দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আব্বাসিয়া খলীফা তাঁহাকে কার্ম্মাথিয়া সন্দেহে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করার জন্য মাহ্‌মুদকে লিখিয়া পাঠান। সোলতান খেলাতটী বাগ্দাদে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে খলীফার ক্রোধাগ্নি হইতে রক্ষা করেন। হাসনক প্রভুর মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীয় পদ বজায় রাখিতে সমর্থ হন।

সমর-বিভাগের ভার সেনাপতির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ-মন্ত্রীর উপাধি ছিল আরিদ। সামরিক ব্যাপারে সোলতান তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পদাতিকেরা অশ্বারোহীদের ন্যায় দ্রুত গমনে সমর্থ হইত না বলিয়া তিনি পদাতিক সৈন্য কম রাখিতেন। প্রাদেশিক বাহিনী ব্যতীত শান্তির সময় তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা সম্ভবতঃ লক্ষাধিক ছিল না। অবশ্য যুদ্ধের সময় এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত। যাহাতে জাতি বিশেষের প্রাধান্য স্থাপিত না হয়,

তজ্জন্য মাহ্মুদ গোরী, আরব, আফগান, খোরাসানী, ভারতীয় প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় লোককে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিতেন। তাঁহার ৪০০০ দেহরক্ষী ও ১৭০০ হস্তী ছিল। দেহরক্ষীরা সাধারণতঃ ক্রীতদাস ও হস্তী-চালকদের অধিকাংশই হিন্দু হইত। সৈন্যদলের এই দুইটী প্রয়োজনীয় বিভাগ মাহ্মুদ নিজের প্রত্যক্ষ পর্য্য-বেক্ষণাধীনে রাখিতেন। তৎফলে তিনি অনেক সন্দেহজনক যুদ্ধে ঘোর সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বিজয় লাভে সমর্থ হন। তাঁহার সৈন্যেরা অত্যন্ত সুশিক্ষিত হইত। শাসন-বিভাগের ন্যায় এখানেও কেবল গুণ ও যোগ্যতাই উন্নতির মাপকাঠি ছিল। সামান্য সৈনিকও ক্রমে সেনাপতি হইতে পারিত।

সোলতান মাহ্মুদের এক বিরাট গুপ্তচর-বাহিনী ছিল। পুরুষের ন্যায় রমণীরাও ইহাতে ভর্ত্তি হইত। তাহারা বৈদেশিক রাজা, সাম্রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারী, এমন কি খোদ শাহ্জাদাগণের কার্য্যের উপরও নজর রাখিত। তাহাদের সংগৃহীত প্রয়োজনীয় সংবাদ সাহেব-ই-বারিদ বা পোষ্ট-মাষ্টারের মারফতে সোলতানের নিকট প্রেরিত হইত। সাধারণতঃ অশ্বারোহীরাই ডাক বহন করিত; কিন্তু ভয়ের কারণ থাকিলে সাহেব-ই-বারিদের চরেরা সূফী, মুসাফির বা সওদাগরের ছদ্মবেশে জুতা, ঘোড়ার জিন, ফাঁপা ছাতা বা লাঠির ভিতরে লুকাইয়া পত্র লইয়া যাইত।

বিচারের জন্য প্রত্যেক শহরে এক জন কাজী ও প্রত্যেক প্রদেশে এক জন কাজী-উল্-কুজাত বা প্রধান কাজী ছিলেন। কাজী-উল-কুজাত বিচার ব্যতীত অধীন কাজীদের কার্য্যের প্রতিও লক্ষ্য

রাখিতেন। কাজীদের আদালতে উকীল-মোখ্‌তারের বালাই ছিল না। তাঁহারা নিজেরাই বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনিয়া বিশেষ বিবেচনার পর রায় দিতেন। কোন পক্ষেরই কোর্ট-ফি বা অন্য কোন খরচ লাগিত না। মাহ্‌মূদ কেবল অতি-বিখ্যাত ও চরিত্রবান মুফ্‌তি বা ফকীহ্‌কেই কাজী নিযুক্ত করিতেন। * তিনি নিজেও প্রত্যহ বিচারে বসিতেন। তখন যে কেহ তাঁহাকে নিজের অভিযোগ জানাইতে পারিত। তিনি যথাসাধ্য উহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় সমস্ত শাহ্‌জাদা, উজীর ও অন্যান্য বড় কর্ম্মচারী স্ব স্ব বিভাগের সাধারণ বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

প্রত্যেক শহরেই একটী দুর্গ থাকিত। কোত্‌ওয়াল প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। মোহ্‌তাসেব খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা, জিনিষ-পত্রের ওজন ও লোকের নৈতিক অবস্থার তত্ত্ব লইতেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই সরকারী কর্ম্মচারী ও প্রধান নাগরিকদের পরামর্শ গৃহীত হইত। ইহা বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল শাসনের পূর্ব্বাভাশ।

---

* Nazim, 148.

মানুষ মাহ্‌মুদ

দোষে-গুণে মানুষের সৃষ্টি; মাহ্‌মুদেরও দোষ-গুণ ছিল। তিনি মহর্ষি ছিলেন না; যাঁহারা তাঁহাকে দোষের আকর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাঁহার চরিত্র অতি জটিল; তিনি একাধারে গৃহী, সম্রাট, বিচারক, সেনাপতি, দিগ্বিজয়ী—সবই। এই জটিলতা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ধীরভাবে তাঁহার চরিত্রের প্রত্যেকটী দিক্ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার দোষ নিতান্ত নগণ্য ও উপেক্ষনীয়; উহার তুলনায় তাঁহার গুণ এত অধিক যে, তিনি যে কোন যুগের এক জন আদর্শ মানব বলিয়া ন্যায়তঃ সম্মান পাইতে পারেন।

সোলতান মাহ্‌মুদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। সম্ভবতঃ তাঁহার মহিষীর সংখ্যা চারি জনের অধিক ছিল না। তিনি সাত পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মারা যান।

মাহ্‌মুদ প্রথমে হানাফী ছিলেন। পরে তিনি ইবনে কার্রামের মত গ্রহণ করেন; ইহার অনুগামীরা কোরানের শাব্দিক অর্থমাত্র স্বীকার করিত, রূপক মানিত না। পরিশেষে মাহ্‌মুদ শাফেয়ী মজ্‌হাব অবলম্বন করেন। পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন চিন্তা করিতেন।

মানুষ মাহ্মুদ

মাহ্মুদের স্বাধীন চিন্তা কিন্তু, তাঁহাকে আকবরের ন্যায় বিপথ-গামী করে নাই। তিনি গোঁড়া মোসলমান ছিলেন। সুন্নী খলীফাকে তিনি যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। ফাতেমিয়া খলীফা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহারা বিরুদ্ধ মত পোষণ করিত, তাহাদের উপর তিনি খড়্গ-হস্ত ছিলেন। কেবল এ সময়ই তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইত।

সোলতান মাহ্মুদ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পালন করিতেন। দৈনিক নামাজ ও কোরান পাঠ বা'দ যাইত না। এমন কি ভীষণ যুদ্ধের মধ্যেও তিনি নামাজ পড়িয়া খোদার নিকট সাহায্য চাহিতেন। খোদাও ভক্তের ডাকে সাড়া দিতে কার্পণ্য করিতেন না। প্রতি রমজানে তিনি জাকাতের (আয়ের ১/৪০) টাকা হিসাব করিয়া রাখিতেন। এই বিপুল অর্থ লোকের দুঃখ নিবারণে ব্যয়িত হইত। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তিনি হজ্ব্ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হজ্ব্-যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বেদুইনেরা যাহাতে তাঁহাদের উপর জুলুম না করে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন। দোষের মধ্যে মাহ্মুদ মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেন; কিন্তু তাহা চিত্ত-বিনোদনের জন্য, নেশার খাতিরে নহে।

ফকীর-দরবেশেরা সাধারণতঃ মাহ্মুদের নিকট প্রশ্রয় পাইতেন না। কিন্তু তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকদের সম্মান করিতেন। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া তিনি বিখ্যাত দরবেশ আবুল

হাসান খারাকানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। আবু সৈয়দ আবদুল মালেক দরবারে আসিলে সোলতান স্বয়ং তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া নিতেন।

মাহ্মুদের অন্তর মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। এই স্বার্থপর জগতে তাঁহার ভ্রাতৃ-স্নেহ যে কোন যুগে অনুকরণের যোগ্য। পরাজিত ইস্মাঈলকে তিনি শুধু বন্দী করিয়া রাখেন ; কারাগারে তাঁহার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। * এমন কি নিজের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেও ভ্রাতৃবৎসল সোলতান তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন নাই, নিরাপদতার খাতিরে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন মাত্র। তাঁহার অপর ভ্রাতা নসর সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রথমে খোরাসানের সেনাপতি ও পরে সিস্তানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সুবুক্তিগিন যখন মারা যান, ইউসুফ তখন শিশু মাত্র। মাহ্মুদ তাঁহাকে নিজ পুত্রের সহিত প্রতিপালন করিয়া শিক্ষাদান করেন। নসরের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার শূন্য পদে নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ সোলতানের অনুরোধেই ১০২৭ খৃষ্টাব্দে খলীফা তাঁহাকে দুইটী উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

মাহ্মুদ স্নেহবান পিতা ছিলেন। পুত্রগণের শিক্ষার জন্য তিনি অত্যন্ত যত্ন গ্রহণ করিতেন। লেখাপড়া ব্যতীত তিনি

* "...Ismail was allowed every indulgence consistent with his position."—Elphinstone, 317.

তাঁহাদিগকে যুদ্ধ-বিদ্যায়ও সুশিক্ষিত করেন। যাহাতে তাঁহারা শাসন-কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের উপর বিভিন্ন প্রদেশের ভারার্পণ করা হয়। মস্‌উদ প্রথমে হেরাত ও পরে রাই রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মোহাম্মদ জুজানন শাসন করিতেন। কনৌজ অভিযানের সময় তাঁহার উপর সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার পর্য্যন্ত ন্যস্ত হয়।

পুত্রদের প্রতি সোলতানের যেমন গভীর স্নেহ ছিল, তাঁহারাও তেমন তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভক্তি করিতেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটী তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। গজনায় থাকিয়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা এক জনের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না মনে করিয়া মাহমুদ মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বার রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। মস্‌উদকে মাত্র রাই, ইরাক ও খোরাসান এবং মোহাম্মদকে অবশিষ্ট সাম্রাজ্য প্রদত্ত হয়। ইহাতে জ্যেষ্ঠ শাহ্‌জাদা স্বভাবতঃই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন। সোলতানের কয়েক জন ক্রীতদাস এমন কি তাঁহাকে বন্দীকৃত করিয়া মস্‌উদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। শাহ্‌জাদা তাহা জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হও; পিতার বিরুদ্ধে আমি কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইব না। তাঁহার তিরস্কার আমার সহ্য হইবে, কিন্তু আমি তাঁহার অপমান বরদাস্ত করিতে পারিব না। সমগ্র জগতে তোমরা তাঁহার তুল্য নরপতি খুঁজিয়া পাইবে না। কোন জননী মাহ্‌মুদের ন্যায় সন্তান গর্ভে ধারণ করেন নাই।"

সোলতান মাহ্‌মুদ

মাহ্‌মুদ সদানন্দ প্রকৃতির লোক ছিলেন। সৈন্য, কর্ম্মচারী সভাসদ্ সকলের সহিতই তাঁহার সদ্ভাব ছিল। অন্যান্য বড় দিগ্বিজয়ীর ন্যায় তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করিতেন। সাময়িক ক্রোধের বশে কখনও তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। কথিত আছে, বল্‌খে তাঁহার একটী সুন্দর বাগান ছিল। নাগরিকদিগকে ইহা রক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিতে হইত। তাহারা ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে এই অনাবশ্যক খরচের দায় হইতে অব্যাহতি দেন। বস্তুতঃ ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই মাহ্‌মুদের দয়া ও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইত।

সম্রাট মাহ্‌মুদ

মাহ্‌মুদের পূর্ব্বেই খলীফারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এই সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিকেরা সমগ্র প্রাচ্যে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। নিজেদের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা নিয়ত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া চতুর্দ্দিকে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাজেই এক জন শক্তিশালী সম্রাটের অভ্যুদয় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মাহ্‌মুদ সে অভাব পূরণ করেন। তাঁহার আমলে পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের খণ্ড-রাজ্যগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়; উহাদের ধ্বংস-স্তুপের উপর এক সম্রাটের অধীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতিগত পার্থক্য ও কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও এক শাসনে আসিয়া একতা-সূত্রে গ্রথিত হয়।

সোলতান মাহ্‌মুদ সর্ব্বপ্রথম মোসলমান সম্রাট। তাঁহার পূর্ব্বে খলীফারা যুগপৎ রাজা ও ধর্ম্ম-গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিতেন। মাহ্‌মুদের সময় হইতে খেলাফৎ ও সোলতানৎ দুইটী ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ধর্ম্ম-নীতি হইতে রাজ-নীতিও পৃথক হইয়া যায়। ধর্ম্ম রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হওয়ায় মোসলমান ও অ-মোসলমানের একত্র বাস অধিকতর সম্ভবপর হইয়া পড়ে।

সোলতান মাহ্‌মুদ

মোসলমানদের মধ্যে রাজত্বের (monarchy) অভ্যুদয়ের জন্য মাহ্‌মুদই দায়ী। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজপুরুষের জন্ম ও তদীয় বংশ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়; সেলজুক সোলতান ও দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা শাসন-নৈপুণ্যে এবং তৈমুর ও চেঙ্গীজ দিগ্বিজয়ে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যান। কিন্তু তাই বলিয়া মাহ্‌মুদের গৌরব হ্রাস পাইতে পারে না। প্রতিষ্ঠাতার ক্রটী থাকিতে বাধ্য।

সোলতান মাহ্‌মুদ সে যুগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নরপতি।* তাঁহার আমলে গজনভী সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। আব্বাসিয়া খেলাফৎ ধ্বংসের পরে প্রাচ্যে এত বড় সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হয় নাই। সিংহাসনারোহণকালে মাহ্‌মুদ সামানিয়াদের অধীনে গজনা, বাস্ত্‌ ও বল্‌খের রাজা মাত্র ছিলেন। এক বৎসর অতীত না হইতেই খোরাসান তাঁহার দখলে আসে; সামানিয়াদের অধীনতা-পাশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অন্যান্য রাজার ন্যায় খলীফার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ক্রমে গোর, রাই, জাবল, সিস্তান, খ্বারিজম, ইস্পাহান, কাফিরিস্তান ও গর্ষিস্তান তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। কাসদর, মাক্‌রাণ, জুর্জ্জন, তাবারিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাঞ্জাব স্ব-রাজ্যভুক্ত করেন। কনৌজ, কালঞ্জর, গোয়ালিয়র, নারায়ণপুর, দক্ষিণ কাশ্মীর

---

*"Thus died Mahmud, certainly the greatest sovereign of his own time..."—Elphinstone, 333.

ও গঙ্গা-দোয়াবের বহু রাজা তাঁহাকে কর দানে বাধ্য হন। ফলে মাহ্মুদের সাম্রাজ্য ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর তীর হইতে গঙ্গানদী এবং আরল সাগর ও ট্রান্স্-ওক্সিয়ানা হইতে ভারত মহাসাগর, সিন্ধু দেশ ও রাজপুতনার মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২০০০ মাইল ও প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে ১৪০০ মাইল। *

সত্য বটে, সামানিয়া বংশের পতন ও ভারতীয় রাজাদের অনৈক্যের ফলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারের সুবিধা হয়; সত্য বটে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই গজনভীদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়; তথাপি এই রাজ্য-বিস্তার অতি আশ্চর্য্যজনক। এক দিকে তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দুদের ও অন্য দিকে স্বজাতীয় তুর্কদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইত। মধ্য-এশিয়ার দুর্দ্দান্ত জাতিরা নিরন্তর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিত। কিন্তু স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী সকলের বিরুদ্ধেই মাহ্মুদ তুল্য সফলতা লাভ করেন। বস্তুতঃ একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করা সামান্য প্রতিভার কার্য্য নহে। †

অনেকের ধারণা, মাহ্মুদ কেবল রাজ্য জয় করিয়াই যাইতেন, বিজিত জনপদের শাসন-সৌকর্য্যের সুব্যবস্থা করিতেন না।

* Nazim. 169.

†"It was no mean genius that could expand a litttle mountain principality into an empire..."—Lane-poole, Mediaeval India, 32.

বর্ত্তমানে অধ্যাপক হবীব জোর-গলায় এই মত প্রচারের ভার লইয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মাহ্মুদ কোন নূতন আইন প্রনয়ণ বা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন নাই, করিবার অবসরও পান নাই। শাসন-কার্য্যে খেলাফতের আইন-কানুন প্রয়োগ করিয়াই তিনি চমৎকার সফলতা লাভ করেন।

কোন সাময়িক পত্রে জনৈক উদীয়মান লেখক লিখিয়াছেন, মাহ্মুদের গঠনমূলক প্রতিভা ছিল, একথা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। ইতিহাস সোলতানের প্রতিভার সাক্ষী। কোন থার্ড ক্লাস এম্-এর অবিশ্বাসে তাহা উড়িয়া যাইতে পারে না। মাহ্মুদের পক্ষে এরূপ লোকের ওকালতীর কোনই প্রয়োজন নাই। অনেক বড় ঐতিহাসিক তাঁহার গঠন-প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "মাহ্মুদের গঠন-মূলক প্রতিভা অত্যন্ত অধিক ছিল।* তাঁহার সময় রাজ্যে এরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল যে, পথিকেরা নিরাপদে লাহোর হইতে সুদূর খোরাসানে গমনাগমন করিতে পারিত।" কীন বলেন, "মাহ্মুদ যেমন বিস্তৃত রাজ্য জয় করিতেন, তেমন তাহা বিজ্ঞতার সহিত সুশাসন করিতেও পারিতেন।" † তিনি যে কেবল পিতৃরাজ্য

---

*"Mahumd was richly endowed with creative genius."—Dr. Iswari Prasad, Mediaeval India, 90.

†"...he was able to make extensive conquests and to rule them well and wisely."—Keene, History of India, vol. 1, 30.

বর্দ্ধিত করিয়াই যান নাই, সঙ্গে সঙ্গে উহা দৃঢ়ীকৃত (consolidated) করারও ব্যবস্থা করেন, স্যার উল্‌স্‌লী হ্যাগও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। * গিবন বলেন, "মাহ্‌মুদ গজনভীর প্রজারা সুখ-শান্তিতে কাল কাটাইত। প্রাচ্যের লোকেরা আজিও তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।" †

উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের নিকট সেকালে রাজদ্রোহ অনেকটা পবিত্রতা বলিয়া বিবেচিত হইত। মাহ্‌মুদ প্রায়ই রাজধানী হইতে সুদূর উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ সীমান্তে অনুপস্থিত থাকিতেন। অথচ দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন সেনাপতি, শাহ্‌জাদা বা শাসনকর্ত্তা তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করেন নাই; কোথাও কোন প্রজা-বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয় নাই, একটী প্রদেশ হইতেও তিনি বেদখল হন নাই। সুশাসিত ও দৃঢ়ীকৃত না হইলে এই বিশাল সাম্রাজ্যে কখনও এরূপ অভগ্ন শান্তি বিরাজ করিত না। নিরন্তর দিগ্বিজয়ে ব্যস্ত থাকিয়া, কোন নূতন আইন বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি না করিয়া কেবল প্রাচীন আইনের সাহায্যে এরূপ সুশাসন প্রবর্ত্তিত করা কম গৌরবের কথা নহে।

পাঞ্জাব মাহ্‌মুদের গঠন-প্রতিভার অন্যতম প্রমাণ। সেখানে গজনভীদের ক্ষমতা এত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লবের

---

* Cambridge History of India, iii, 12.

† "The name of Mahmud the Gaznavide is still venerable in the East ; his subjects enjoyed the blessings of prosperity and peace ;"—Gibbon, vi, 243.

মধ্যে দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াও হিন্দুরা একমাত্র নগরকোট ব্যতীত আর কোন স্থান পুনরধিকার করিতে পারে নাই। * গজনভীরা দৃঢ়ভাবে পাঞ্জাব তাঁহাদের শাসনে রাখেন। অনেক সময় তাঁহারা সুদূর গঙ্গা-তীরের নগরাবলী লুণ্ঠন করিতেও সৈন্য প্রেরণ করিতেন। আলাউদ্দীন গোরী গজনা ধ্বংস করিলে (১১৫২ খৃঃ) শাহ্‌জাদা খস্‌রু যখন অসহায় অবস্থায় লাহোরে উপস্থিত হন, তখন প্রজারা তাঁহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লয়। † স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াও গজনভীরা সুদূর প্রবাসে আরও পয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

গজনভী সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্যও অনেকে মাহ্‌মুদের গঠন-প্রতিভাহীনতাকে দাবী করিয়া থাকেন। এই মত ঠিক নহে। কীন বলেন, "গজনভী বংশের পতন নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। বড় বড় দিগ্বিজয়ী সব সময় বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায়ই অপদার্থ হইয়া থাকেন। বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অলিভার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি সৈনিক-রাজা অপেক্ষা অধিকতর সফলকাম হইলেও মাহ্‌মুদের বেলায়ও এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই

---

* Marsden, History of India, 37-8.

† "...He (Khusrou) was received amidst the acclamations of his subjects who were not displeased to see the seat of government permanently transferred to their country."—Elphinstone, 349.

অপদার্থ ছিলেন।" * "মাহ্মূদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন না।" † প্রধানতঃ এই কারণেই দশ বৎসর পরে জেন্দেকানের যুদ্ধে পরাক্রান্ত সেলজুকদের হাতে গজনভী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়, মাহ্মূদের গঠন-প্রতিভার অভাবে নহে। সেলজুকেরা তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য গ্রাস করিতে পারে নাই। অনেক দুর্ব্বল হইলেও গজনভীরা আরও এক শতাব্দীর অধিক কাল পর্য্যন্ত গোর, পাঞ্জাব, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। সোলতান মঊদুদ সেলজুকদের হাত হইতে ট্রান্স্-ওক্সিয়ানাও কাড়িয়া লন। কাজেই 'নয় বৎসর পরে গজনভী সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া যায়' মিঃ হবীবের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক নহে।

অধ্যাপক সাহেব গজনভী সাম্রাজ্যকে 'উদ্দেশ্য-বিহীন সৌধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি মাহ্মূদের সম্মুখে কোন 'আদর্শ'ও দেখিতে পান নাই। যদি রাজ্যবিস্তার ও সুশাসন রাজার উদ্দেশ্য ও আদর্শ হয়, তবে মাহ্মূদের অবশ্যই তাহা ছিল। কেহ ইচ্ছা করিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিলে তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। হবীব বলেন, "সেল্জুকেরা যখন এই উদ্দেশ্যহীন সৌধ ভূমিসাৎ করিয়া দেয়, তখন কেহই তাহার জন্য ক্রন্দন করা দরকার মনে

* "But his treasury,...were all inherited by unworthy sons."—Keene, 36.

† "There was not one of his race so able or vigorous as he had been."—Hunter, 94.

করে নাই।" সোজা কথায়, গজনভীরা কুশাসনের দরুণ কাহারও স্নেহ-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত ইতিহাস এই মতের পরিপন্থী। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মিত্রও পর হইয়া যায়। অকৃতজ্ঞ আব্বাসিয়া খলীফা বিজয়ী তুগ্রলকে স্বীয় প্রতিনিধি বলিয়া অভিনন্দিত করেন। ভারতের পথে পলাতক মস্উদের হিন্দু-মোসলমান দেহ-রক্ষীরা তাঁহার ধন-ভাণ্ডার লুটিয়া নেয়। কাজেই স্বার্থপর লোকেরা তাঁহার পতনে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু কেহই গজনভীদের জন্য দুঃখিত হয় নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। লোকে তাঁহাদিগকে এত ভক্তি করিত যে, সয়ফুদ্দীন গোরী গজনা অধিকারের পর নিজকে জনপ্রিয় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সকলকাম হইতে পারেন নাই। * যদি গজনভীরা সুশাসক না হইতেন, যদি লোকে তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত না হইত, তবে কিছুতেই তাহারা নবাগত নিরপরাধ ভূপতিকে বিদূরিত করার জন্য হৃত-গৌরব পলাতক সোলতানকে ডাকিয়া আনিত না।

মাহ্মুদ সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ নরপতি। † পারস্য ও ভারতের যুগ-যুগব্যাপী সঞ্চিত অর্থে তাঁহার কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রাচীন কালের কোন রাজার সাত সন্দূক

---

* Elphinstone, 348.

† "Mahmud was, perhaps, the richest king that ever lived."—Elphinstone, 338.

রত্ন ছিল শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'খোদাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমায় শত সন্দুক রত্ন দিয়াছেন।'

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহ্মুদ অর্থলোভী ছিলেন। যদি অর্থলোভ বলিতে অর্থ সংগ্রহের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বুঝায়, তবে তিনি বাস্তবিকই এ দোষে দোষী। অর্থের জন্য তিনি বারংবার হিন্দুস্তানের দুর্গম জনপদে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত দেন। কিন্তু বিজেতার পক্ষে অর্থলাভের বাতিক দোষনীয় নহে। জগতের প্রত্যেক বড় দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় তুল্য অর্থলোভী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, চেঙ্গিজ, নেপোলিয়ান কে শত্রু-রাজ্য বা শত্রুর ধনাগার লুণ্ঠন করেন নাই? যুদ্ধ-নীতি অনুযায়ী ইহা চিরকাল বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য মাহ্মুদকে দায়ী করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

লোভীর ন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিলেও ব্যয়ের বেলায় মাহ্মুদের লোভের পরিচয় পাওয়া যাইত না। জগতের অপর কোন দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় এত মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট-সঞ্চিত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন নাই। তিনি প্রত্যহ গরীব-দুঃখীদিগকে খয়রাত দিতেন। সাম্রাজ্যের অক্ষম লোকেরা তাঁহার নিকট ভাতা পাইত। যুদ্ধের স্বেচ্ছা-সেবকদিগকেও তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার দুই লক্ষ গিনি বা চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। সহস্র দিনারের কম তিনি কাহাকেও দান করিতেন না। তিনি গজনায় বহু স্কুল ও একটী

বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিভিন্ন ভাষার দুর্লভ গ্রন্থে এক বিরাট লাইব্রেরী পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নানা দেশের বিচিত্র ও দুষ্প্রাপ্য পদার্থে তাঁহার যাদুঘর ভরিয়া উঠে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু টাকা জমা রাখিয়া দেন; অধ্যাপকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দানের জন্য তিনি মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন।

মাহ্‌মুদের নির্ম্মিত 'স্বর্গের কণে' প্রাচ্যের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এই বিরাট জামে-মস্‌জেদ মর্ম্মর ও গ্যানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। ইহার সৌন্দর্য্য দর্শক মাত্রেরই তাক্ লাগাইয়া দিত। গালিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের শামাদান ও অন্যান্য আসবাব-পত্রে ইহা সুসজ্জিত থাকিত। লোকের সুখ-সুবিধার জন্য প্রজাবৎসল সোলতান রাজ্য-মধ্যে বাঁধ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রভুর অনুকরণে আমীরেরাও নিজেদের ও সর্ব্ব-সাধারণের জন্য বহু আড়ম্বরময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই গজনা ও প্রাদেশিক রাজধানীসমূহ মস্‌জেদ, তোরণ, প্রস্রবণ, প্রমোদ উদ্যান ও পয়ঃপ্রণালীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে গজনা কতকগুলি কুটীরের সমষ্টি মাত্র ছিল; শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মাহ্‌মুদের মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয়ের ফলে উহা অচিরে প্রাচ্যের সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরময় নগরে পরিণত হয়। *

* "...the city of Gazni......had become the grandest in Asia"..."—Marshman, History of India, 23.

ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে মাহ্মুদের দরবারের আড়ম্বরের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। চারিটী পালক-খচিত লম্বা টুপি পরিয়া সোণার গদা হাতে লইয়া দুই হাজার ক্রীতদাস তাঁহার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ও দুইটী পালক-ভূষিত টুপি মাথায় দিয়া রূপার মুগুর হাতে দুই হাজার ক্রীতদাস বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত। * তাঁহার শিবিরের জাঁকজমক দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার সৈন্যেরা উচ্চশ্রেণীর সাজ-সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। এক একটী অভিযানে তাঁহার অজস্র অর্থ ব্যয় পড়িত। বাস্তবিক পক্ষে মাহ্মুদের অর্থলোভে কৃপণতা ছিল না। লোভের বশে দেশ-বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেও কিরূপে বিজ্ঞতা ও বদান্যতার সহিত তাহা ব্যয় করিতে হয়, মাহ্মুদ তাহা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। জগতের আর কেহই অর্থ ব্যয়ের সময় তাঁহার ন্যায় এরূপ বিচার-বুদ্ধি ও আড়ম্বরের পরিচয় দিতে পারেন নাই। †

অবিশ্রান্ত ব্যয়ের পরেও মাহ্মুদের রাজকোষে অতুল অর্থ সঞ্চিত থাকে। কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই ধন-ভাণ্ডার ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মনের দুঃখে অশ্রুপাত করেন, অথচ কৃপণতা করিয়া একটি কপর্দ্দকও কাহাকে দান করেন নাই।

---

* Wilson, History of India, 44.

† "...he was unrivalled in the judgment and grandeur with which he knew how to spend it."—Elphinstone, 336.

অস্-সাবির বিলুপ্ত তাজারিবুল উমামের বরাত দিয়া শ্রদ্ধেয় সোলতানের মৃত্যুর পৌনে দুই শত বৎসর পরে ইব্‌নে জাওজি তাঁহার আল্-মোন্তাজামে সর্ব্বপ্রথম এই ঘটনার উল্লেখ করেন। আরও প্রায় তিন শত বৎসর পরে (১৪৯৫ খৃঃ) মির খাওয়ান্দ তাঁহার রওজাতুশ্-শাফায় সোলতানের ক্রন্দনের এই মন-গড়া ব্যাখ্যা দেন। সমসাময়িকদের নিকট মাহ্‌মুদ সদাশয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের কবিরা 'পিল্‌ওয়ার' বা 'হস্তী-ভার স্বর্ণ-রৌপ্য-দাতা' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতার সহিত এই অর্থ-গৃধ্নুতার গল্প মোটেই খাপ খায় না। * কত ঘোরতর যুদ্ধ, কত মূল্যবান রক্তপাত করিয়া ঐ বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে হয়ত তাহারই করুণ চিত্র তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। খুব সম্ভবতঃ সেজন্যই তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। মাক্‌রাণ তথনও বিদ্রোহী ; সেলজুকেরা আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। শাহ্‌জাদাদের মধ্যে কেহ যে ধনবৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। কাজেই তখন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য রাজকোষের প্রত্যেকটী কপর্দ্দক রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল। জীবনে মাহ্‌মুদ যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে যে

---

* "...it is hard to reconcile this reputation for avarice with what is recorded of the Sultan's gifts..."
—Lave-poole, 31.

অবশিষ্ট টাকা বিলাইয়া দিয়া পুত্রকে ফতুর করিয়া যান নাই, ইহা তাঁহার বিজ্ঞতারই প্রমাণ, কৃপণতার পরিচয় নহে।

মাহ্মূদের সৌধাবলী তাঁহার স্থাপত্যানুরাগের পূর্ণ বিকাশ। গজনার সমস্ত স্থাপত্য-কীর্ত্তিই জাহান-শোজ আলাউদ্দীন আগুনে পোড়াইয়া দেন। মহামতি মাহ্মূদের সমাধি ও দুইটী মিনার বা বিজয়-স্তম্ভ মাত্র এখন উহার স্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছে। মিনারদ্বয়ের প্রত্যেকটী ১৪৪ ফুট উচ্চ ও পরস্পর হইতে ৪০০ গজ দূরে অবস্থিত। উত্তরেরটী মাহ্মূদ ও অপরটী মস্উদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দুইটীই ইষ্টক-নির্ম্মিত ও সযত্ন-সম্পাদিত অতি-সুন্দর দগ্ধ-মৃত্তিকার কাজে সুশোভিত; উহাদের চাকচিক্য অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। * দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনারের আদর্শ এবং পারস্যের দামগান ও মেসোপতেমিয়ার মুজাহ্ ও তওকের মিনারের অনুরূপ বলিয়া স্থপতিবিদ্দের নিকট এই মিনার দুইটীর গুরুত্ব খুব বেশী।

মাহ্মূদের সমাধি হালফ্যাশনে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। কেবল ইহার মূল্যবান দ্বারগুলিই এখন অবিকৃত অবস্থায় ভ্রমক্রমে আগ্রা দুর্গে রক্ষিত আছে। ইহাতে আরব্য প্রণালীর খোদাই-কার্য্য ও বিজড়িত নক্শা অসাধারণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য এগুলি দর্শকদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। †

---

* "...Furgussion, Indian and Eastern Architecture, 496.

† Cambridge History of India, iii, 574-5.

সোলতান মাহ্‌মুদ

মাহ্‌মুদের পূর্ত্ত-কার্য্যের মধ্যে সোলতানের বাঁধ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; আজিও লোকে ইহার জল ব্যবহার করিতেছে। রাজ-ধানী হইতে ১৮ মাইল দূরে এক গিরিপথের মুখে নাওয়ার নদীর জলের ২৫ ফুট উর্দ্ধে এই বাঁধ নির্ম্মিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ গজ; স্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্য উপরে একটী ও নিম্নে আর একটী স্রোতোদ্বার ছিল। ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন গোরী ইহা ধ্বংস করিয়া দেন। ৩৭০ বৎসর পরে বাবরের আদেশে ইহার সংস্কার সাধিত হয়।

প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে মাহ্‌মুদ বরাবর সচেতন ছিলেন। তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। "সোলতান মাহ্‌মুদ ও বিধবার গল্প" তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। এই রমণীর পুত্র সাম্রাজ্যের কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে দস্যুহস্তে নিহত হয়। তাহার আবেদনে মাহ্‌মুদ দস্যু-দমন করিয়া যাত্রীদল রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাহাকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। নিশাপুরের জনৈক আমিল এক রমণীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে সংবাদ পাইয়া মাহ্‌মুদ তাঁহাকে বেত্রদণ্ড দিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে অকালে তুষারপাতের ফলে খোরাসানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সদাশয় সোলতান দুঃস্থ লোকদের মধ্যে অর্থ ও শস্য বিতরণের আদেশ দিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণের ব্যবস্থা করেন।

সোলতান মাহ্‌মুদ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ-পরায়ণ নরপতি

ছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার দয়া ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইত। কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সদয় ব্যবহার পাইত। মাহ্মুদ নিষ্ঠুর ছিলেন না। কেহ তাঁহার অসন্তোষ-ভাজন হইলে বড়-জোর তাহার নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ড হইত। এমন কি বিদ্রোহীকেও তিনি চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না। একবার ক্ষমা পাইয়া স্বপদে বহাল হইয়া আবার অপরাধ করিলেও তিনি তাহাদিগকে কখনও কারাদণ্ড ব্যতীত অপর কোন কঠোরতর শাস্তি দিতেন না। কখনও কেহ তাঁহার হস্তে কোন অমানুষিক শাস্তি ভোগ করে নাই। অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী ভূপতির দরবারে ও পরিবারে সচরাচর যে সকল নিষ্ঠুর ও শোকাবহ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, মাহ্মুদ তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।* পুত্র-হত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কখনও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। আরস্লান যাদেব সেলজুকদিগকে নিহত করার বা তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তিনি অবজ্ঞা-

* "...he does not seem to have been cruel. We hear none of the tragedies and atrocities in his court and family which are so common in those of other despots. No inhuman punishments are recorded; and rebels, even when they are persons who had been pardoned and trusted, never suffer anything worse than imprisonment."—

—Elphinstone, 337.

ভরে উত্তর দেন, "খোদার কলম রদ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।"

ন্যায়-বিচারের জন্য সোলতান মাহ্মুদের নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কঠোর হস্তে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ছোট-বড় কাহারও ন্যায়-সঙ্গত শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না। তাঁহার ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। গজনার জনৈক সওদাগর মস্‌উদের নিকট টাকা পাইতেন। তিনি কাজীর নিকট নালিশ করিলে শাহ্‌জাদা তাড়াতাড়ি দাবী মিটাইয়া দিয়া তবে নিষ্কৃতি পান। আলী নুশ্‌তিগিন নামক জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইস্‌লামী আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য করায় মাহ্‌মুদ তাঁহাকে ধৃত করিয়া বেত্রদণ্ড দান করেন।

অনেক রাজারই প্রিয়পাত্র থাকে। যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা এই অপদার্থগুলিকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। মাহ্‌মুদের কোন প্রিয়পাত্র ছিল না। যোগ্যতাই তাঁহার কর্ম্মচারী নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। প্রিয়জন বলিয়া কখনও তিনি কাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

দিগ্বিজয়ী মাহ্মুদ

জগতের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে মাহ্মুদ অন্যতম। ইরাক হইতে গঙ্গা-দোয়াব ও খ্বারিজম হইতে কাথিওয়াড় পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগে তিনি দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল অতুল উদ্যম ও অপূর্ব্ব সফলতার সহিত যুদ্ধ করেন। কখনও তিনি তুর্কিস্তানের সমস্ত রাজার সহিত সংগ্রাম করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে উত্তর ভারতের রাজগণের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত। চল্লিশ বৎসরের অবিশ্রান্ত সমরে কখনও তিনি পরাজিত হন নাই। পারস্য, তুর্কিস্তান ও হিন্দুস্তানের নরপতিরা তাঁহার নামে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন। বর্ব্বর তাতারদিগকে তিনি শির দরিয়ার উত্তরে হাঁকাইয়া দেন। পারস্যের ক্ষুদ্র রাজবংশগুলি তাঁহার বীরত্বে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উত্তর ভারতের রাজগণের ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত বা পদানত করেন। ইস্পাহান হইতে বুন্দেলখণ্ড ও সমরকন্দ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের সমস্ত রাজাই তাঁহার হস্তে পরাজিত ও অপদস্থ হন। আফগানিস্তান, ট্রান্স-ওক্সিয়ানা, খোরাসান, তাবারিস্তান, সিস্তান, (দক্ষিণ) কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বৃহদংশে তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হয়। * জগতের

* Browne, Literary History of Persia, vol. ii, 95.

অতি অল্প দিগ্বিজয়ীই তাঁহার ন্যায় এত বিপুল খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। *

দিগ্বিজয়ী হিসাবে মাহ্মুদ আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। † পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াই গ্রীক বীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। অধিকতর দুর্গম জনপদ অতিক্রম করিয়া মাহ্মুদ সুদূর গুজরাট ও কালঞ্জর পর্য্যন্ত অভিযান করেন। আলেকজাণ্ডার ভারতের যে অবস্থা দেখিয়া যান, মাহ্মুদের সময় তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানকালে পারস্যে একই সম্রাটের হুকুম চলিত। মাহ্মুদের জমানায় উহাও ভারতের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটী মাত্র বড় যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া গ্রীক বীর পারস্য হস্তগত করেন; সোলতান মাহ্মুদকে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া তথাকার রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হয়। এক জন সম্রাটকে দুই একটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য হস্তগত করা বড় সহজ; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজার

---

†"···there are few of the world's conquerors who have established a reputation equal to his."—Latif, History of the Punjab, 87.

†" The Sultan of Gazna surpassed the limits of the conquest of Alexander."—Gibbon, vi, 241 ; "The exploits of Alexander in the East were rivalled, and, in fact, surpassed."—Habib, 66.

সহিত পৃথকভাবে যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য গঠন করা অতি কঠিন। এক জনের পরাজয়ে কেবল তাঁহার রাজ্যই বিজেতার হস্তগত হয়; পরবর্ত্তী রাজ্যটী অধিকারের জন্য আবার তাঁহাকে নূতন সংগ্রামে নামিতে হয়। * ভারতে এই দুর্লঙ্ঘ্য বিপদের সম্মুখীন হইয়াই আলেকজাণ্ডারের বীরত্ব ফুরাইয়া যায়। যদি মাহ্‌মুদের ন্যায় পারস্যেও তাঁহাকে এই সঙ্কটে পড়িতে হইত, তবে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভারত-সীমান্তে পৌঁছিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, পাঞ্জাব প্রবেশ ত দূরের কথা।

সোলতান মাহ্‌মুদ সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা সামরিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি। † তিনি সৈনিক-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অবদানই তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও রাজ্য-কৌশলের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। ¶ তিনি বুয়াইহিয়াদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দেন, জিয়ারিয়াদের রাজ্য (তাবারিস্তান) তাঁহার দখলে আসে,

---

* "Each victory meant no more than the conquest of one or more princes ; the rest were uneffected, and, since there was no single supreme head to treat with, the most complete success in the field did not imply the submission of the country."

—Lane-poole, 28.

† "the greatest military genius of the age."—Habib, 31.

¶ "of military genius and of statecraft his achivements afford ample evidence."—Browne, ii,95,

সামানিয়ারা তাঁহার হস্তে পরাভূত হন, বার বার তিনি ভারত আক্রমণ করেন। পিতৃ-রাজ্যের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমান্ত বর্দ্ধিত করিয়া তিনি বুখারা ও সমরকন্দ হইতে কনৌজ ও গুজরাট পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহই ভীরু ছিলেন না। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহাকে বীরের ন্যায় বাধা দেন। মাহ্‌মুদ যেমন কোন নূতন আইন প্রণয়ন করেন নাই, তেমন কোন অভিনব যুদ্ধ-পদ্ধতি বা অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনিও পুরাতন পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার শত্রুদের ধর্ম্মগত ও জাতিগত একতা ছিল, মাহ্‌মুদের সৈন্যদের তাহাও ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। মাহ্‌মুদের ব্যক্তিগত উদ্যম, দয়া, শৌর্য্য, সাহস, খোদা-ভক্তি, গঠন-শক্তি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, রণ-চাতুর্য্য, সতর্কতা, মর্য্যাদা ও অদ্ভুত দ্রুতগতি এই অপূর্ব্ব সফলতার কারণ।

সোলতান মাহ্‌মুদ সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। অনেক সময় তিনি সৈন্যদলের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। কথিত আছে, জীবনে তিনি বাহাত্তরটী অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হন। মুলতান অবরোধের সময় তিনি এত শত্রু নিধন করেন যে, রক্ত জমিয়া তাঁহার হাতে তরবারির মুষ্টি আটকিয়া যায়; শেষে খুলিবার জন্য গরম জলে হাত ডুবাইয়া রাখিতে হয়। অনেক যুদ্ধেই তিনি নামাজ পড়িয়া খোদার নিকট বিজয় ভিক্ষা করিতেন। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও

তাঁহার সাহস, অকুতোভয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতা সৈন্যদের মনে নব উৎসাহের সঞ্চার করিত এবং আত্ম-বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত।

মাহ্‌মুদের শৌর্য্য সর্ব্বযুগে অনুকরণীয়। কোন পরাজিত রাজাকে নিহত করিয়া কখনও তিনি স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। তিনিই আকবর ও অন্যান্য পরবর্ত্তী রাজার উদারনীতির আদর্শ। সকলেই তাঁহার নিকট ক্ষমা ও সদ্ব্যবহার পাইতেন। রাজনীতির অনুরোধে কাহাকেও তিনি সিংহাসনচ্যুত করিতেন, কাহারও সহিত কর লইয়া সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। কোন কোন রাজা তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া বিনা যুদ্ধেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। এক বার মাহ্‌মুদ বুয়াইহিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বালক-রাজার মাতা তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "আমার স্বামী আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় সিংহাসন একটী বালক ও রমণীর হাতে আসিয়াছে। আপনি কি তাঁহাদের শৈশব ও দুর্ব্বলতার সুযোগে রাজ্য আক্রমণে সাহসী হইবেন? যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাহাতে আপনার কোনই গৌরব নাই; কিন্তু পরাজিত হইলে লজ্জার সীমা থাকিবে না।" সুচতুরা মহিলার এই পত্র পাইয়া মাহ্‌মুদ তাঁহার মৃত্যু ও বালক-রাজার বয়ঃ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পশ্চিম-পারস্যের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধে নামেন নাই। *

অধিকাংশ দিগ্বিজয়ীর ন্যায় মাহ্‌মুদ নিষ্ঠুর ছিলেন না।

---

* Gibbon, vi, 243-4.

ওয়াথেন ও গ্যারেট বলেন, "মাহ্মুদ খামখা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন বা নিরর্থক শোণিতপাত করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।"* টেইলার সাহেব বলেন, "প্রতিহিংসার বশে মাহ্মুদ কখনও কাহারও প্রাণ লন নাই, কোন বে-পরওয়া হত্যাকাণ্ডে কখনও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা। সে যুগের আদর্শ দিয়া বিচার করিলে মোটের উপর মাহ্মুদকে দয়ালু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।"† তাঁহার সদয় ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া সময় সময় শত্রুরা বিনা বাধায় বা নামমাত্র বাধা দানের পর তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিত।

মাহ্মুদের উৎসাহ ও উদ্যমের তুলনা নাই! তাঁহার কর্ম্ম-বহুল জীবনে বিশ্রামের অবসর ছিল না। সাধারণতঃ তিনি গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়ায় ও শীতকালে ভারতে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেন। কেবল মানুষের নিকট হইতেই তিনি বাধা পান নাই, প্রকৃতিও তাঁহাকে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা দান করিয়াছিল। শহীদের উপকরণে গঠিত না হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না।

---

* "...he does not seem to have been wantonly cruel or to have taken life needlessly."—Wathen and Garret, History of India, 102-3.

† "No instance, it may be said to his credit, are recorded of wanton or revengeful massacre or executions···Tried by the standard of his times, therefore, Mahmmed must be considered, on the whole, humane."—Taylor, History of India, 34.

প্রখর শীতাতপ, তুঙ্গ গিরি, প্রশস্ত নদী, অনুর্ব্বর মরুভূমি, অসংখ্য শত্রু, অদম্য রণ-হস্তী-যূথ কিছুই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তিনি গোরের দুর্গম পর্ব্বত-মালা ও কাশ্মীরের তুষারাচ্ছন্ন গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করেন; উত্তাল তরঙ্গময় নদী, মুষলধার বৃষ্টি, পাঞ্জাবের জনমানবহীন ক্ষারময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও রাজ-পুতনার দগ্ধ মরুভূমি—সমস্তই তাঁহার অদম্য ইচ্ছার সম্মুখে তৃণবৎ ভাসিয়া যায়। তিনি লোহকোট জয় করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্থানটী অতি দুর্গম; মাহ্মুদকে যে সেখানে আরও অধিকতর দুর্য্যোগ ভোগ করিতে হয় নাই, তাহাই একমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়।*

তুর্ক, হিন্দু, আরব, আফগান, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমবায়ে মাহ্মুদের সৈন্যদল গঠিত হইলেও কঠোর শৃঙ্খলা বিধানের ফলে তাহারা একযোগে কার্য্য করিতে শিখে। তাতারেরা মনে করিত, যুদ্ধজয়ের পক্ষে সাহসই যথেষ্ট; পক্ষান্তরে রাজপুতেরা বিজয় লাভের জন্য সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিত। মাহ্মুদ তাহাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে, সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই সফলতা লাভের মূল। যে হস্তী বহু যুদ্ধে ভারতীয়দের পরাজয়ের কারণ, তাহার সাহায্যেই তিনি

---

* "the only wonder is, that two invasions of so inaccessible a country should have been attended with so few disasters."

—Elphinstone, 323.

পারস্ত ও মধ্য-এশিয়ার অনেক যুদ্ধ জয় করেন। প্রধানতঃ বিজ্ঞতার সহিত হস্তী সাজাইবার গুণেই বল্খের যুদ্ধে ইলাক খাঁর বিপুল বাহিনীর পরাজয় ঘটে। * তাঁহার গঠন-শক্তি এতই চমৎকার ছিল।

কখন কাহাকে আক্রমণ করিলে কৃতকার্য্য হইবেন, অদ্ভুত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির বলে মাহ্মুদ গজনায় বসিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন। যাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোমর বাঁধিয়াই লাগিতেন। তজ্জন্য তিনি বরাবরই বিজয়-মাল্যের অধিকারী হইতেন।

মাহ্মুদের দ্রুতগতি দেখিয়া শত্রুরা বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। একই শীত ঋতুতে তিনি মুলতানের কার্ম্মাথিয়া ও বল্খের তাতারদিগকে পরাজিত করেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিতস্তা নদী-তীরে এক জন বিদ্রোহী সেনাপতিকে ধৃত করিতেও তাঁহার সময়ের অভাব হয় নাই। বিদ্রোহী সুখ পাল যখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুম-ঘোরে অচেতন, তখন মাহ্মুদ অকস্মাৎ মুলতানের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বজ্রনাদে তাঁহার সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। কাসদরের রাজা সোলতানের নিকটবর্ত্তী হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার শহর ঘিরিয়া ফেলেন। দুস্তর রাজপুতনা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি এত অকস্মাৎ অন্হিবরায় উপস্থিত হন যে, গুজরাটের রাজা ভারতের অন্যতম

---

* Elphinstone, 327.

শ্রেষ্ঠ নরপতি হইলেও তাড়াতাড়ি নগর ত্যাগে বাধ্য হন। থানেশ্বর অভিযানের সময় তিনি পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া এত দ্রুত-বেগে অগ্রসর হন যে, পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াও রাজা বিজয়পাল তাঁহাকে বাধা দানে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।* এমন কি যখন তিনি মরণ-রোগে আক্রান্ত, তখনও অপূর্ব্ব দ্রুতগতিতে মেনুচেহরের ঘাড়ে আপতিত হন এবং সেলজুকদিগকে খোরাসান হইতে হাঁকাইয়া দেন। শত্রুরা সম্মিলিত হওয়ার পূর্ব্বেই মাহ্মুদ বিদ্যুদ্গতিতে তাহাদের এক জনকে পরাজিত করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। এমতাবস্থায় তাঁহার সাহসী, অথচ মন্থরগতি শত্রুরা যে উৎসন্ন যাইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? উত্তরকালে নেপোলিয়ান এই নীতি অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন।

মাহ্মুদ ছিলেন সেনাপতি, সৈন্য নয়। প্রয়োজন হইলে তিনি শত্রু-বাহিনীর নিবিড়তম অংশে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু অনর্থক বীরত্ব দেখাইতে যাইয়া তিনি বৃথা বিপদ টানিয়া আনিতেন না। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক সেনাপতি ছিলেন। যখন যাহাকে আক্রমণ করিলে জয়ের আশা নাই, তিনি তখন তাহাকে আক্রমণ করিতেন না। কোন অসম্ভব

* "Mahmud marched with such rapidity through Punjab as to forestall Bijay Pal's preparations and found the shrine at Thanesar undefended."—C. Hist. of India, iii, 18.

কার্য্যে হাত দিতেন না বলিয়াই তিনি কখনও পরাজিত হন নাই।

সেনাপতির প্রধান গুণ সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা। কেহ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে মাহ্‌মুদ কঠোর হস্তে তাহার শাস্তি দিতেন। এক বার এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করিল, এক সিপাহী তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাহার পত্নীর সহিত ব্যভিচার করিতেছে। সোলতান বলিলেন, "সে আবার কবে আসিবে আমাকে বলিয়া যাও; আমি স্বয়ং তাহার শাস্তি বিধান করিব।" নির্দ্দিষ্ট তারিখে মাহ্‌মুদ ছদ্মবেশে তাহার গৃহে গিয়া দেখিলেন, পাপিষ্ঠ সত্যই গৃহকর্ত্তার পত্নীর সহিত শুইয়া আছে। আলো নিবাইয়া দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পরে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়া অপরাধীর মুখ দেখিয়া তিনি সেজ্‌দায় যাইয়া খোদার নিকট শোকর করিতে লাগিলেন। ভূমি হইতে উঠিয়া মাহ্‌মুদ পেট ভরিয়া জল পান করিলেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া লোকটী বিস্ময় গোপন রাখিতে পারিল না। সোলতান বলিলেন, "এই লোকটীকে আমার পুত্র বলিয়া সন্দেহ হয়; যাহাতে স্নেহবশে কর্ত্তব্যে ত্রুটী না ঘটে, তজ্জন্য আমি বাতি নিবাইয়া দেই। শাস্তি দানের পর যখন দেখিলাম, সে অন্য লোক, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান না করিয়া কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। তোমার

নালিশের পর হইতে আজ তিন দিন পর্য্যন্ত আমি কিছুই খাই নাই!" *

ভারতাভিযান মাহ্মুদের সামরিক প্রতিভার চরম বিকাশ। ইহা সাহস ও সতর্কতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তিনি বিরাট নদী ও গভীর অরণ্য পূর্ণ এক অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। তথাকার অধিবাসীদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একটী মাত্র ভুলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে পারিত। এক বার পরাজিত হইলেই শত্রুরা তাঁহার সৈন্যগণকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিত। অন্যের নিকট ইহা অন্ধকারে পদক্ষেপ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু মাহ্মুদ অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া সাবধানে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশ্য তাঁহার অনুচরদের সাহস ও নির্ভীকতাও তুল্য প্রশংসনীয়। প্রথমে তিনি দশ বার মঞ্জিলের অধিক দূর যাইতে সাহসী হন নাই। এই সতর্কতার ফলে তাঁহার জয়লাভ হইতে লাগিল। দিন দিন সফলতা লাভ করায় ক্রমশঃ তাঁহার নামের মর্য্যাদা বাড়িল। শত্রুদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তিনি তিন বার গঙ্গাতীরে ও এক বার গুজরাটে প্রবেশ করেন।

---

*"I extinguished the light that my justice might be blind and inexorable; so painful was my anxiety that I had passed three days without food..."

—Gibbon, vi, 243; Elphinstone, 338.

মাহ্মুদের অভিযান বিজয়-যাত্রা বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। মন্দিরের অর্থের জন্য তাঁহাকে ভীষণ সঙ্কটের ঝুঁকি মাথায় লইতে হইত। একটী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হইলেও হৃত-সাহস ভারতীয়দের মনের বল ফিরিয়া আসিত। ১০১০ খৃষ্টাব্দে বিনা বাধায় রাজধানী হইতে তিন মাসের পথ দূরে গিয়া মাহ্মুদের মনে বাস্তবিকই এই ভয় হয়। কিন্তু তাঁহার নামের মর্য্যাদা এত বেশী ছিল যে; রাজা গন্দ বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নৈশ অন্ধকারে পলাইয়া যান। বস্তুতঃ অবিশ্রান্ত পরাজিত হওয়ায় ভারতীয় রাজাদের মনে মাহ্মুদের নাম শ্রবণেই ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইত। তিনি শারওয়ার রাজা চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে নিদার ভীম তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, "সোলতান মাহ্মুদ ভারতীয় রাজাদের ন্যায় কৃষ্ণকায় লোকের নেতা নহেন। তাঁহার ও তাঁহার পিতার নাম শুনিলেই সৈন্যেরা ভয়ে পলাইয়া যায়।.. প্রাণ বাঁচাইতে চাহিলে আপনি কোথাও লুকাইয়া থাকুন।" এই পত্র পাইয়াই চাঁদ রায় পর্ব্বতে পলাইয়া যান। মোসলমানেরা বরাবর জয় লাভ করিবে, এ ধারণা ভারতীয়দের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

ভারতে মাহ্মুদের সফলতার প্রধান কারণ, তাঁহার অবিভক্ত শক্তি। গজনার ধনবল, জনবল কেবল তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত হইত। পক্ষান্তরে আর্য্যাবর্ত্ত অসংখ্য ঈর্ষ্যাপরায়ণ রাজা, মহারাজা ও স্থানীয় সর্দ্দারদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তাঁহাদের কেহই অপরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহিতেন না। এক গোত্রের

রাজপুত অন্য গোত্রের সহিত কলহ-বিবাদে মত্ত থাকিত। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় তাহারা সহজে নিজেদের ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা অপেক্ষা বৃহত্তর স্বার্থের কল্পনা করিতে পারিত না। অবশ্য সময় সময় যে তাহারা দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইত না, এমন নহে। ঐহন্দের যুদ্ধে হিন্দু রমণীরা নিজেদের গহনা-পত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ সাহায্য প্রেরণ করে। একাধিক বার ভারতীয় রাজারা বিজেতার অগ্রগতি রোধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দেয়। ঐহন্দে ভালরূপে যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই যখন বিরাট হিন্দু বাহিনী পলাইয়া যায়, তখনই তাহাদের এই আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা মাহ্‌মুদের চক্ষে ধরা পড়ে। ইহার সুযোগ গ্রহণে কখনও তাঁহার ত্রুটী দেখা যায় নাই।

বিভিন্ন জাতীয় লোক লইয়া গঠিত হইলেও বহু বৎসর পর্য্যন্ত একযোগে কার্য্য করায় সোলতানের সৈন্যদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয়। অতীত বিজয়ের গৌরব ও ভাবী লুণ্ঠনের আশায় তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়; বরাবর একই প্রভুর অধীনে কাজ করায় তাহারা কেবল তাঁহারই জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিখে। পক্ষান্তরে জায়গীর-প্রথা বিদ্যমান থাকায় রাজপুতেরা জায়গীর-দারের যত আজ্ঞাবহ হইত, রাজার জন্য তত মাথা ঘামাইত না। নিরন্তর পরাজিত হওয়ায় পশ্চাদনুসরণ ও হত্যার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই তাহাদের কল্পনা-নেত্রে ভাসিয়া উঠিত না।

জাতিভেদ প্রথার দরুণ চারি বর্ণের মধ্যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই

যুদ্ধ করিত। তজ্জন্য সকল সময় বিজেতাকে বাধা দানের জন্য পর্য্যাপ্ত সৈন্য পাওয়া যাইত না। সামরিক জায়গীরের দোষে সৈন্য সংগ্রহেও বিলম্ব হইত। পক্ষান্তরে মাহ্মুদের বেতন-ভোগী সৈন্যেরা অহরহ প্রভুর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিত। সময় সময় ভারতীয়েরা তাঁহাকে বাধা দানে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যুদ্গতিতে তাহাদের রাজধানী বা দেব-মন্দির লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়িতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে মাহ্মুদের অসীম শ্রেষ্ঠত্ব ও তদানীন্তন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দরুণই ভারতীয়েরা তাহাদের ধন-প্রাণ ও তীর্থস্থান রক্ষা করিতে পারে নাই।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহ্মুদের ভারতাক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য লুণ্ঠন, রাজ্যস্থাপন নহে। কেহ কেহ তাঁহাকে এক জন 'বড় দস্যু' বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অধ্যাপক হবীব বলেন, "তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, একটী তুর্ক-পারস্য সাম্রাজ্য গঠন করা; ভারতাভিযান সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র।" ভারত আক্রমণের ফলে মাহ্মুদের জনবল ও নামের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু সে অর্থ তিনি কেবল পারস্য জয়েই ব্যয় করেন নাই, ভারত জয়েও তাহা সমভাবে ব্যয়িত হয়। নামের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুরূপ উপকারে আসে। সম্ভবতঃ ইহা-দ্বারা ভারতেই তিনি বেশী উপকার পান।

অধ্যাপক সাহেব মাহ্মুদের পারসিক ও ভারতীয় নীতির মধ্যেও পার্থক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি নাকি পশ্চিমাঞ্চলের

বিজিত জনপদ বরাবরই স্বরাজ্যভুক্ত করিতেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ায় মাহ্মুদের অনেক করদ নরপতি ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি গজনার চতুর্দ্দিকস্থ নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করিতেন, কিন্তু দূরবর্ত্তী রাজ্য করদ রাজাদের হাতে রাখিয়া দিতেন। ভারতেও তিনি একই নীতির অনুসরণ করেন। তিনি পাঞ্জাব স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন, কিন্তু দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলি করদ রাজাদের হাতে থাকে। অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে রাই, খ্বারিজম প্রভৃতি কয়েকটী দূরবর্ত্তী প্রদেশও প্রত্যক্ষভাবে মাহ্মুদের শাসনাধীনে আসে। ভারতে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার কারণ, ঐ রাজ্যগুলি মোসলমান-প্রধান দেশ। অথচ ভারতে মোসলমান অধিবাসী ছিল না। মাহ্মুদ বড় জোর প্রধান প্রধান নগরে কয়েক হাজার সৈন্য রাখিতে পারিতেন। তাহারা কি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে দাবাইয়া রাখিতে পারিত? অধ্যাপক হবীব নিজেই স্বীকার করেন, "যেখানে শাসন-তন্ত্রের সমর্থনের জন্য মোসলমান অধিবাসী নাই, সেখানে ইস্লামী শাসন প্রবর্ত্তন বাস্তব রাজনীতির বহির্ভূত ব্যাপার। ভারত জয় সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই মাহ্মুদ সে চেষ্টা করেন নাই।" অথচ এই 'অসম্ভব' ও 'বাস্তব রাজনীতির বহির্ভূত কার্য্য' করেন নাই বলিয়া অন্যান্য ঐতিহাসিকের সহিত সুর মিলাইয়া তিনিও মাহ্মুদকে দায়ী করিয়া থাকেন! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

ভারত স্বরাজ্যভুক্ত করা বাস্তবিকই তখন অসম্ভব ছিল; কিন্তু

মাহ্‌মুদের আদৌ সে ইচ্ছা ছিল না, এ কথা ঠিক নহে। পাঞ্জাব ইহার প্রমাণ। অবশ্য ইহা দখলে আনিতে বিলম্ব ঘটে। এই বিলম্বকে অধ্যাপক সাহেব সোলতানের ভারত জয়ের অনিচ্ছার অন্যতম প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এখানেও উক্ত কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, তিনি মোসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করেন। নানা কারণে ইস্‌লাম এখানে অধিকতর সফলতা লাভ করে। সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পাঞ্জাবের সহিত মোসলমান-দের সংশ্রব ঘনিষ্ঠতর ছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশে মাহমুদ সাধারণতঃ একাধিক বার অভিযান করিতেন না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেখান হইতে ইস্‌লামের চিহ্ন মুছিয়া যাইত। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবে তিনি বহুবার যুদ্ধ করেন। প্রত্যেক অভিযানেই তাঁহাকে এই প্রদে-শের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। কাজেই তাঁহার সঙ্গে যে সকল ধর্ম্ম-প্রচারক থাকিতেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অধিকতর সকলকাম হন। দ্বিতীয়তঃ, অন্যায়রূপে আনন্দ পাল বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে সিংহাসনচ্যুত করা মাহ্‌মূদের ইচ্ছা ছিল না। ভীমপাল যখন অনর্থক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান, তখন ন্যায়তঃ পাঞ্জাব অধিকারের পথে আর কোন বাধা রহিল না। ইহাও নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার। মাহ্‌মুদ বহু পূর্ব্বেই আনন্দ পালকে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করেন। ত্রিলোচন পালের হাত হইতে তিনি নন্দনা কাড়িয়া লন। ভীমপাল ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতেন। সুতরাং

পাঞ্জাবের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্ব্বেই গজনভী সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

ভারতের ইতিহাসে পাঞ্জাব অধিকারের গুরুত্ব অপরিমেয়। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব তীরে স্থায়িভাবে মোসলমান সৈন্য স্থাপিত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতে মোসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। খসরুর সময় স্থায়িভাবে লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় গজনভীরা চিরতরে ভারতের বাসিন্দা হইয়া যান। শত চেষ্টা করিয়াও হিন্দুরা তাঁহাদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে নাই। এই পাঞ্জাবকে ভিত্তি করিয়াই উত্তর কালে মোহাম্মদ গোরী হিন্দুস্তানে মোসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। নতুবা এত শীঘ্র দিল্লীতে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ভারতে মোসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ গৌরব একমাত্র মাহ্‌মুদেরই প্রাপ্য। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরবেও ন্যায়তঃ তাঁহার দাবী আছে; উহা একা মোহাম্মদ গোরীর প্রাপ্য নহে।

সৌভাগ্যবশতঃ দুই এক জন ঐতিহাসিক মাহ্‌মুদের প্রতি কতকটা সুবিচার করিয়াছেন। ওয়াথেন ও গ্যারেট বলেন, "লুণ্ঠন ও দিগ্বিজয় তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়।"* কীন বলেন, "যে সকল স্থান শাসন করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল,

* " ... his chief motive seems to have been the love of conquest and plunder."—Wathen and Garret, 106.

মাহ্মুদ তাহা স্থায়িভাবে রাজ্যভুক্ত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন। সে জন্য ভারতে তিনি পিতৃরাজ্য (প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক বেশী) লইয়াই তৃপ্ত থাকেন ; দেশের অবশিষ্ট অংশ লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেও তথাকার শাসন-ভার নিজের হাতে রাখার চেষ্টা করেন নাই।" * বাস্তবিকই পশ্চিমে ও উত্তরে তাঁহার রাজ্য-সীমা এত বর্দ্ধিত হয় যে, সেকালে এক ব্যক্তির পক্ষে উহা শাসন করা কঠিন ছিল। তিনি যে পূর্ব্বদিকে উহা আরও বৃদ্ধি করেন নাই তাহা তাঁহার অপরাধ নহে, রাজনৈতিক বিজ্ঞতারই পরিচয়।

---

* "He also knew how to avoid the temptation of extending his conquests permanently beyond his means of administering them. Therefore, in India he contented himself with the possession of his father ; and while amassing wealth by the plunder of the rest of the country, made no attempt to retain possession of the government."—Keene, 36.

উদার মাহ্‌মুদ

ঐতিহাসিকেরা সাধারণতঃ মাহ্‌মুদের ভারতাভিযানকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। আজ কাল যেমন কোন ঘটনায় এক পক্ষে হিন্দু, অপর পক্ষে মোসলমান—এমন কি এক দিকে হিন্দুর ও অন্য দিকে মোসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও অনেকে তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইয়া থাকেন, মাহ্‌মুদের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। হিন্দু-মোসলমানের সংগ্রাম বলিয়া লোকে তাঁহার ভারতাক্রমণকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মাহ্‌মুদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহা যে নিছক বিজয়াভিযান মাত্র, সমসাময়িক প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা, মাহ্‌মুদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত, তাঁহার সৈন্যদল গঠনের বৈশিষ্ট্য ও হিন্দুদের সহিত তাঁহার অনুপম উদার ব্যবহারই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মাহ্‌মুদের বহু পূর্ব্বেই ধর্ম্ম-যুদ্ধের যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সময় মোসলমানেরা যে সকল যুদ্ধ করিত, তাহা কেবল রাজ্য রক্ষা, রাজ্য বিস্তার বা অনুরূপ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নহে। এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মাহ্‌মুদের

ভারতাভিযান কিছুতেই ধর্ম্ম-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।*

ধর্ম্ম-যোদ্ধার গৌরব দান দূরের কথা, "সমসাময়িক মোসলমান ঐতিহাসিকেরা ধর্ম্মের প্রতি মাহ্‌মূদের অন্ধভক্তি ছিল বলিয়াও স্বীকার করেন না; তাঁহারা বরং তাঁহাকে সন্দেহবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া থাকেন।‡ তিনি নাকি (কেয়ামতের) সাক্ষ্য-প্রমাণে বিশ্বাস করিতেন না, পরলোকও মানিতেন না। অবশেষে যখন তাঁহার মনে হয়, তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, হজরত স্বপ্নে আসিয়া তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছেন।"

সোলতানের সৈন্যেরা বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করিত; হজরত বা প্রাথমিক খলীফাদের অনুচরদের ন্যায় তাহাদের কেহই ইস্‌লাম প্রচারের মহান্ আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে আসে নাই। মাত্র পরবর্ত্তী দুইটী অভিযানে কয়েক হাজার স্বেচ্ছা-সেবক যোগ দেয়। নিয়মিত সৈন্যের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা

---

* "The non-religious character of his expeditions will be obvious to the critic who has grasped the salient features of the age···It is imposible to read a religious motive in them." —Habib, 77.

‡ "Mahometan historians are so far from giving him credit for a blind attachment to the faith that they charge him with scepticism".—Elphinstone, 337

নগণ্য; দ্রুতগতিতে অভ্যস্ত ছিল না বলিয়া তাহাদের দ্বারা সোলতানের বিশেষ উপকার হয় নাই।

মারাঠা বাহিনীর ন্যায় মাহ্‌মুদের সৈন্যদলে হিন্দু, মোসলমান উভয় জাতীয় লোকই ছিল। উদরান্নের জন্য তাহারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে সমভাবে যুদ্ধ করিত। এরূপ উদর-সর্ব্বস্ব মিশ্রিত বাহিনী লইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করা চলে না; উহার জন্য চাই শতে শতে স্বার্থহীন আত্মোৎসর্গকারী বীর-পুরুষ।

মাহ্‌মুদ ছিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী, অলী বা ধর্ম্ম-প্রচারক নহেন। উন্নত সদাশয়তা ও পরমত-সহিষ্ণুতা তাঁহার ভারতীয় নীতির ভিত্তি। তিনি হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা দান করেন। তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতেন, কখনও তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগে বাধ্য করিতেন না। * কয়েক জন ভারতীয় রাজা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক গরজ সিদ্ধির জন্য। সোলতানের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যান।

হিন্দু রাজাদের সহিত ব্যবহার কালে বরাবরই মাহ্‌মুদের দয়া ও ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যাইত।† এমন কি তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

---

* "Content to deprive the unbelievers of their worldly goods, he never forced them to change their faith."—Habib, 77.

† "In his dealings with the Hindu rulers, he showed leniency and mercy."—Wathen and Garret, 103.

করিলেও সদাশয় সোলতান তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেন না।* পুরুর প্রতি সদাশয়তা দেখাইয়া আলেকজাণ্ডার বিখ্যাত হন; মাহ্মুদ তাঁহার দয়া ও মহানুভবতায় শত শত রাজাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। তিনি হিন্দু-দিগকে অবাধে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিতেন। সন্ধি-শর্ত্তানুযায়ী ভারতীয় করদ রাজারা তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে তাহাদিগকে লইয়া জনৈক হিন্দু সেনাপতির অধীনে একটী পৃথক বাহিনী গঠিত হয়। সোলতানের কর্ম্মচারী মহলে তিনি অত্যন্ত সম্মানার্হ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পরে বহুসংখ্যক হিন্দু গজনার গৃহ-বিবাদে যোগদান করে। তিলক নামক জনৈক প্রতিভাবান ক্ষৌরকার-সন্তান সোলতান মস্উদের আমলে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইনি মাহ্মুদের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ভারতের সহিত তাঁহার পরিচয়ের মাত্র সাত বৎসর পরে এক দল হিন্দু সৈন্য মোসলমানদের সহিত একযোগে অ-মোসলমান ইলাক খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিজয়-মাল্যের অধিকারী হয়।† তাহাদের প্রতি

---

*" ··in his dealings with Hindoo princes he was in all cases merciful, even though they had proved unfaithful, to their promises."
—Taylor, 84.

† C. History of India, iii, 11.

দুর্ব্ব্যবহার করিলে কিছুতেই তাহারা সুদূর মধ্য-এশিয়ায় তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিতে যাইত না।

মাহ্মুদের হিন্দু সৈন্যদিগকে যে ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। গজনার বুকে বসিয়া তাহারা শাঁখ বাজাইয়া অবাধে মূর্ত্তি পূজা করিতে পারিত। তাহাদের বাসের জন্য পৃথক পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। মাহ্মুদ ধর্ম্মান্ধ হইলে তাহারা তাঁহার রাজধানীতে এরূপ স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে পারিত না, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার নিকট এত সুবিধাজনক ব্যবহারও পাইত না।

মোস্লেম-বিদ্বেষী হইলেও এলফিনষ্টোন বলেন, "প্রাচ্যবাসীরা যেমন লোভী বলিয়া মাহ্মুদের খুব নিন্দা করিয়া থাকে, ইউরোপীয় লেখক মহলেও তেম্নি ধর্ম্মান্ধ বলিয়া তাঁহার বদ্নাম আছে। প্রথম অভিযোগ সত্য হইলেও অপর অপবাদ ভ্রান্ত ধারণার ফল বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধে মাহ্মুদের লাভ হইত; বিশেষতঃ তাঁহার সময় ইহাই ছিল যশোলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। তজ্জন্যই তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। অন্যান্য মোসলমানের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার আগ্রহ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন; হয়ত এ বাসনা তাঁহার মনেও জাগিত। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কখনও তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বার্থ ত্যাগ করেন নাই। এমন কি যখন ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার কোনও ক্ষতি হইত না, তখনও তিনি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহা দেখাইতেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার যাবতীয় অভিযানে যত লোক ইস্লামে দীক্ষিত হয় নাই,

একটী প্রদেশ স্থায়িভাবে দখলে আনিলে তদপেক্ষা অধিক লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত।...

এমন কি যে সকল স্থান তাঁহার অধিকারে আসে, সেখানেও মাহ্মুদ ধর্ম্ম প্রচারে কোন উৎসাহ দেখান নাই। তিনি গুজরাটে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন; লাহোর তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। অথচ এই সকল স্থানের কোন লোককে তিনি আদৌ ইস্লামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না, বলপূর্ব্বক দীক্ষা দান ত দূরের কথা।* তাঁহার একমাত্র মিত্র কনৌজের রাজা অ-দীক্ষিত হিন্দু ছিলেন। লাহোরের রাজার সহিত তাঁহার সম্পর্ক কেবল রাজনীতিতেই নিয়ন্ত্রিত হইত, ধর্ম্মের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তিনি যখন এক জন হিন্দু সন্ন্যাসীকে

---

* "Mahmud carried on war with the infidels because it was a source of gain, and, in his day, the greatest source of glory···he never sacrificed the least of his interests for the accomplishment of that object; and he even seems so have been perfectly indifferent to it, when he might have attained it without loss.···

Even where he had possession he showed but little zeal. Far from forcing conversions.. we do not hear that he ever made a convert at all."

—Elphinstone, 336.

গুজরাটের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার চিন্তা-স্রোত নিশ্চিতই অন্য পথে ধাবিত হয়, ইস্‌লাম প্রচারের কথা তাঁহার মনেও হয় নাই।"

এলফিনষ্টোন ও মৌলভী দাকাউল্লা খাঁর মতে মাহ্‌মুদ হিন্দুদের দেব-মন্দির লুণ্ঠন করায় তাহাদের মনে ইসলামের প্রতি উৎকট ঘৃণা জন্মে। অধ্যাপক হবীব এই মত ধার করিয়া তাহাতে রং ফলাইয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আল্‌-বেরুনি বলেন, হিন্দুরা ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই, তাহাদের ধর্ম্মের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্যের জন্য। দ্বিতীয় কারণ, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের আন্তরিক ঘৃণা। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরোধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ"—ইহাই তাহাদের চিরন্তন নীতি। তৃতীয় কারণ, পৌরোহিত্য-বিরোধী নব ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণদের প্রবল শত্রুতা। চতুর্থ কারণ, হিন্দুদের আত্মম্ভরিতা। আল্‌-বেরুনির ভাষায়, জগতে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশ ও হিন্দু ছাড়া অপর কোন জাতি আছে বা আর কেহ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান জানে, একথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। পঞ্চম কারণ, তখনও ধর্ম্ম প্রচারের সময় উপস্থিত হয় নাই; এজন্য শান্তির দরকার। মাহ্‌মূদের যুগ নিছক বিজয়ের যুগ। মোহাম্মদ গোরী হিন্দুস্তান দখলে আনিয়া নিয়মিত শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলে ইস্‌লাম প্রচারের সুবিধা হয়। পারস্যের অদ্বৈতবাদী সূফীদের কল্যাণে ইতোমধ্যে কোরান ও বেদান্তের মধ্যে একটী ছোটখাট সন্ধি হইয়া যায়। পীর-পূজা ও গোর-পূজা আসিয়া মূর্ত্তি-পূজার স্থান গ্রহণ

করে। দর্গাহ্ ও মস্জেদে মানত এবং স্থল বিশেষে গান-বাজনা বা কীর্ত্তন মোসলমানদের বিশ্বাসের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী কালের ইস্লামকে কতকটা হিন্দু ধর্ম্মের টুপি-পরা-সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কাজেই উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে হিন্দুদের মনে স্থান পায়। এতদ্ব্যতীত সমগ্র দেশে ইস্লামী শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শাসক জাতির সহিত সমান সম্বন্ধ স্থাপন, সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে অনেক হিন্দু মোসলমান হইয়া যায়। মাহ্মূদের সময় তাহাদের সম্মুখে এ লোভ ছিল না।

হিন্দুদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার উদারতা প্রদর্শন সত্ত্বেও মাহমুদ তাহাদের কয়েকটী মন্দির লুণ্ঠন ও মুর্ত্তি ভগ্ন করেন। দৃশ্যতঃ ইহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। হবীব প্রভৃতি যে সকল সমালোচক তাঁহাকে 'খামখা রক্তপাত' ও 'বে-পরোয়া মন্দির লুণ্ঠনে'র জন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা মেহেরবানী করিয়া ভুলিয়া যান যে, কেবল যুদ্ধের সময়ই এই সকল তথা-কথিত 'বর্ব্বরতা' অনুষ্ঠিত হয়। পরাজিত শত্রুর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া নেওয়া চিরকাল বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। জগতের সমস্ত বড় বিজেতাই তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা ইহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তবে অন্যত্র সাধারণতঃ কোষাগার লুণ্ঠিত হইত; কিন্তু ভারতে মন্দিরেই বেশী টাকা থাকিত। সুদূর অতীত কাল হইতেই এ দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক। খনি হইতেও যথেষ্ট

স্বর্ণ-রৌপ্য উত্তোলিত হইত। হিন্দুরা অতি ধার্ম্মিক জাতি। তাহাদের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যুগে যুগে ভক্তদের প্রদত্ত অর্থে দেব-মন্দির ভরিয়া যায়। অনেক সময় রাজারাও সেখানে টাকা জমা রাখিতেন। রাজ-ভাণ্ডারের ক্ষয় হইত, কিন্তু দেব-ধন হ্রাস পাইত না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা লইয়া দেশ-বিদেশের লোকে গল্প করিত।

মাহ্‌মুদের সময় এই বিপুল অর্থ জাতীয় বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তিনি মন্দির লুণ্ঠন করিয়া ভারতের যুগ-যুগ-ব্যাপী সঞ্চিত অর্থ গজনায় লইয়া যান। ইহা নিছক অর্থলোভ, ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, মাহ্‌মুদ কখনও কোন ধন-রত্নহীন মন্দির লুণ্ঠন বা ধ্বংস করেন নাই। ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইলে তিনি নির্ব্বিচারে দেশের সমস্ত মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। দ্বিতীয় প্রমাণ, যতদিন মাহ্‌মুদ মন্দিরের অর্থের সন্ধান পান নাই, তত দিন তাঁহার হস্তে কোন মন্দির লুণ্ঠিত হয় নাই। ষষ্ঠ অভিযানে নগর-কোটের মন্দির লুণ্ঠন করিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম হিন্দু তীর্থের অতুল ঐশ্বর্য্যের খোঁজ পান। এই সময় হইতে বড় বড় মন্দির লুণ্ঠন তাঁহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেশের অধিকাংশ টাকা জমা করিয়া হিন্দুরা তাঁহার কাজ সহজ-সাধ্য করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দিরের অর্থের প্রতি মাহ্‌মুদের লুব্ধ দৃষ্টির সন্ধান পাইয়াও তাহারা ইহা অন্যত্র অপসৃত করা বা লুকাইয়া রাখা দরকার মনে করে নাই। তাহারা

কিছু বুদ্ধি খরচ করিলে কেহ তাঁহাকে 'মূর্ত্তি-ভঙ্গকারী' বলিয়া বদ্নাম দিবার সুযোগ পাইত না।

কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ই মাহ্মুদ মন্দির লুণ্ঠন করিতেন; শান্তির সময় কখনও কোন হিন্দু তীর্থ তাঁহার হস্তে লুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং সমর-নীতির দিক্ দিয়া কিছুতেই তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। তাঁহার সময় শত্রুপক্ষের উপাসনাগার লুণ্ঠন করা ন্যায়সঙ্গত সামরিক কার্য্য ও পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়া বিবেচিত হইত। তজ্জন্য সমসাময়িক হিন্দুরা তাঁহার কার্য্যে ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হইত না। একালের ঐতিহাসিক বা সমালোচকেরা না জানিলেও সেকালের ভারতীয় রাজারা বেশ জানিতেন, মাহ্মুদের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক নহে। তজ্জন্য তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাকে প্রচুর ধন-রত্ন উপঢৌকন দিতেন। মাহ্মুদও দেব-মন্দির বা দেব-মূর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রসন্নচিত্তে দেশে ফিরিয়া যাইতেন।

জগতের কোন বড় দিগ্বিজয়ীই ধর্ম্ম নিয়া বেশী মাথা ঘামাইতেন না, দরকার হইলে তাঁহারা ধর্ম্মকে রাজনৈতিক গরজ সিদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহার করিতেন মাত্র। নেপোলিয়ান মিসরে মোসলমানী পোষাক পরিতেন, এমন কি তাহাদের সঙ্গে নামাজ পড়িতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাদের চিত্তজয়। তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে মোসলমান বলিয়া অভিহিত করিলে তিনি নাচার। মাহ্মুদের বেলায় এরূপ ভুল হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। তিনি এক অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ দেশে প্রবেশ করেন।

উদার মাহ্মুদ

সীমান্তের দুর্ভেদ্য গহন বন ও পঞ্চ নদের বাহিরে বহু গ্রাম, নগর ও নির্জ্জন অরণ্যে মোয়াজ্জেনের আজান-ধ্বনি ভাসিয়া উঠে। আলেক জাণ্ডার বা শাহ্‌নামার বীরদের কেহই এমন আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কাজেই তাহা যে সহজে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীদের চিত্ত বিমোহিত করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? পক্ষান্তরে তাঁহার মন্দির লুণ্ঠন দেখিয়া বিধর্ম্মীরা তাঁহাকে স্বভাবতঃই ধর্ম্মান্ধ বলিয়া মনে করিত, অনেকে এখনও করে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখায় শত্রু, মিত্র প্রায় সকলেই মাহ্‌মুদকে ভুল বুঝিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। ধর্ম্ম-যোদ্ধার গৌরব কিছুতেই তাঁহার প্রাপ্য নহে;—খামখা রক্ত-পাতের জন্যও তিনি দায়ী নহেন। শান্তির সময় কখনও কোন হিন্দু তাঁহার হাতে প্রাণ দেয় নাই। যুদ্ধকালীন নর-হত্যার জন্য যদি সিজার, হানিবল, আলেক জাণ্ডার বা নেপোলিয়ান দায়ী না হন, তবে মাহ্‌মুদকেও দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট হিন্দু-মোসলমানে ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু রাজাদের ন্যায় পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার আমীরদিগকেও তিনি সমভাবে উত্যক্ত করিতেন; মোসলমান বলিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট রেহাই পাইতেন না। সিন্ধু ও গঙ্গা তীরে যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়, আমু দরিয়ার তীরে, কাস্পিয়ান সাগর তটে ও পারস্যের মহা-মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বে তুল্য নিরপেক্ষতার সহিত তাহারই পুনরভিনয় ঘটে। এলফিনষ্টোন বলেন, "যুদ্ধ বা অবরোধের বাহিরে তিনি কোন হিন্দুকে হত্যা করিয়াছেন, এমন

কথা কোথাও নাই। তিনি হত্যা করিতেন, শুধু পারস্তের তাঁহার মোসলমান ভাইদিগকে।" *

বস্তুতঃ হিন্দুরা মাহ্মুদের নিকট ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেও মোসলমানেরা পায় নাই। কেহ গোঁড়া সুন্নীদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। নৈতিক অপরাধী ও প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে শাস্তি দানের জন্য তিনি এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। কার্ম্মাথিয়া ও বাতেনীরা তাঁহার হাতে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে। সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশ হইতে ধরিয়া নিয়া তিনি তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। যাহারা মত পরিবর্ত্তন না করিত, তাহারা নির্ব্বাসিত বা প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইত। এমন কি তাহাদের সাহিত্যও এই নিষ্ঠাবান যোদ্ধার ক্রোধানল হইতে রক্ষা পায় নাই। তাঁহার আদেশে তাহাদের প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক কার্ম্মাথিয়া দমনকেও মাহ্মুদের ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাহিয়াছেন। 'পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিতে বসিয়া ব্রাউন সাহেবও এই অনধিকার-চর্চ্চাটুকু না করিয়া পারেন নাই।

---

*"It is nowhere asserted that he ever put a Hindu to death except in battle, or in the storm of a fort. His only massacres are among his brother Mussalmans in Persia."—Elphinstone, 336.

বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা মাহ্‌মুদের ধর্ম্মোন্মত্ততার ফল নহে ; এখানেও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান। তিনি রাজ্যের ধর্ম্মনৈতিক একতায় বিশ্বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা সুন্নী বলিয়া তাহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী ধর্ম্ম-নীতি নিয়ন্ত্রিত না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তদুপরি কার্ম্মাথিয়া ও বাতেনীদের সাহায্যে ফাতেমিয়ারা প্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেন বলিয়া বাগ্দাদের খলীফা তাহাদের প্রতি জাত-ক্রোধ ছিলেন। ক্ষমতাহীন হইলেও হজরতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মোস্‌লেম জগতের যে কোন অংশ যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারিতেন। তাঁহার মঞ্জুরী ব্যতীত কাহারও রাজ-ক্ষমতা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইত না। কাজেই তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের অত্যন্ত সুবিধা হইত। প্রধানতঃ তাঁহার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মাহ্‌মুদ কার্ম্মাথিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিরত হন। তাহারা ইতঃপূর্ব্বে যে ভাবে হজ্বযাত্রীদল ও পবিত্র তীর্থস্থান-সমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে, শত সহস্র সুন্নী যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের হস্তে অকারণে নিহত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ন্যায়-ধর্ম্মের খাতিরেও কার্ম্মাথিয়া দলনের জন্য মাহমুদকে দায়ী করা চলে না।

এলফিনষ্টোন বলেন, "এই মোসলমান-হত্যাও যুগের দোষ, মাহ্‌মুদের নহে। জনৈক উদারতম ইংরেজ ঐতিহাসিক দার্শনিক পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ বলিয়া যে অ-মোসলমান চেঙ্গিজ খাঁর

প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।" *

---

* "Even they were owing to the spirit of the age, not of the individual, and sink into insignificance, if compared with those of Chengiz khan, who was not a Mussalman, and is eulogized by one of our most liberal historians as a model of philosophical toleration."—Elphinstone, 336.

বিদ্যোৎসাহী মাহ্‌মুদ

কেবল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী বলিয়াই ইতিহাসে মাহ্‌মুদের নাম পরিকীর্ত্তিত হয় নাই, সাহিত্য ও শিল্প-কলায় উৎসাহ দানের জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত। "তাঁহার সময় সৈনিকের পক্ষে এরূপ বিদ্যোৎসাহিতা ও শিল্পানুরাগ দুর্লভ ছিল। সাহিত্য ও শিল্পকলার মুরুব্বী হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।" *

যুদ্ধের ন্যায় মাহ্‌মুদ জ্ঞান-চর্চ্চায়ও অনুরূপ আনন্দ লাভ করিতেন। প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় ভারতের গ্রাম-নগর, প্রান্তর-পর্ব্বত মথিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে শত শত মাইল ছুটিয়া অথবা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় অকস্মাৎ আরল সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী খ্বারিজমের উপর আপতিত হইয়া এই অস্থিরচিত্ত দুঃসাহসী বীর-পুরুষ গজনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগে কাব্য ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেন। এমন কি শ্রমসাধ্য যুদ্ধাভিযানের মধ্যেও তিনি

---

* "The real source of his glory lay in his combining the gualities of a warrior and a conqueror, with a zeal for the encouragement of literature and the arts, which was rare in his time, and has not yet been surpassed."—Elphinstone, 333.

কবিতা বা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য একটু অবসর করিয়া লইতেন। তিনি গজনায় বহু স্কুল, একটী বিশ্ব-বিদ্যালয়, এক বিরাট লাইব্রেরী ও একটী যাদুঘর স্থাপন করেন। পুস্তক ও লেখক সংগ্রহ তাঁহার বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোথাও কোন সুধী ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিলেই মাহ্মুদ তাঁহাকে গজনায় আনাইবার জন্য লোক পাঠাইতেন। প্যারিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নেপোলিয়ান বিজিত জনপদের উৎকৃষ্ট শিল্প-দ্রব্যসমূহ লইয়া যাইতেন। মাহ্মুদের কাজ অধিকতর প্রশংসনীয়; কোন নূতন নগর হস্তগত হইলে তথাকার লাইব্রেরীর সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থ গজনায় পাঠাইয়া দিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইত না; তিনি স্বয়ং শিল্পী ও কবিগণকেই রাজধানীতে লইয়া আসিতেন।

বিদ্যানুরাগী সামানিয়া বংশের পতনে বহু কবি ও পণ্ডিত বেকার হইয়া পড়েন। সোলতান মাহ্মুদের জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা গজনায় ছুটিয়া আসিলেন। পারস্য ও খোরাসান এবং আমুদরিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে প্রাচ্যের জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সেখানে সমবেত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত সৌর-মণ্ডলের ন্যায় নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন। ফলে মাহ্মুদের দরবার মর্ত্ত্যের ছায়া-পথে পরিণত হয়।* চারি শত কবি তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন।

* "...he pressed into his service the lights of oriental letters...to revolve round his sun like planets in his firmament of glory."—Lane-poole, 30.

এশিয়ার অপর কোন রাজার দরবারে অদ্যাপি এত অধিক বিদ্বজ্জনের সমাগম হয় নাই। *

বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি মাহ্‌মুদের বদান্যতার সীমা ছিল না। এ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। পণ্ডিতদিগকে তিনি বার্ষিক প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি দিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট আশাতীত পুরস্কার পাইতেন। গাজায়রীর একটী কাশিদার জন্যই সোলতান তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার দেরহাম দান করেন। তিন বার তিনি রাজ-কবি আন্‌সারীর মুখ-মণ্ডল মুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। কেবল ফেরদৌসী ও ও আল্‌-বেরুনীই তাঁহার নিকট আশানুরূপ ব্যবহার পান নাই। কিন্তু সে দোষ একা মাহ্‌মুদের নহে; উহা তাঁহাদের ঈর্ষ্যাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্রের ফল।

বার্থল্ড সাহেব বলেন, মাহ্‌মুদ বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহায্য করিতেন গজনার গৌরব বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃত জ্ঞানানুরাগের অনুরোধে নহে। রাজধানীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ছিল না, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কবি ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নিজেরও কিছু

---

* "He...showed so much munificence to individuals of eminence that his court exhibited a greater assemblage of literary genius than any other monarch in Asia has ever been able to produce."
—Elphinstone, 334.

খ্যাতি ছিল। তিনি ফেকাহ্ সম্বন্ধে তাফ্রিদুল ফুরু নামক এক খানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। যে সকল রাজা সময় সময় কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহাদের তালিকায় আওফি মাহ্মুদকে দ্বিতীয় স্থান দিয়াছেন। তাঁহার লুবাবুল আল্বাবে তিনি সোলতানের দুইটী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। * মাহ্মুদ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কেও যোগদান করিতেন; অবশ্য শিক্ষিত মোসলমানের আন্তরিক উৎসাহ লইয়া, আকবরের ন্যায় মনে বিকৃত সন্দেহ রাখিয়া নহে। এমতাবস্থায় বার্থল্ডের এই অস্বাভাবিক অনুমানের কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

মাহ্মুদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার ফলে পারসিক সাহিত্যের যে বিরাট উপকার সাধিত হয়, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। 'পারসিকেরা তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁহারই নিকট ঋণী।' ‡ হবীব বলেন, 'পারসিক সাহিত্যের নব জাগরণের মুরুব্বীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। তাঁহার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে গজনভী সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ (?) হইয়া যায়, কিন্তু শাহ্নামা অমর।'

যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গজনার দরবার আলোকিত করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এশিয়ায়—এমন কি কেহ কেহ

---

* Browne, ii, 117—8.

‡ "...it is to Sultan Mahmud that she is indebted for the full expansion of her national literature."—Elphinstone, 334.

এশিয়ার বাহিরেও সুপরিচিত। আবু রায়হান আল্‌-বেরুণী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ। ডাক্তার সাচু (Sachau) বলেন, 'বর্ত্তমান সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা পাইয়াও তাঁহার ন্যায় নির্ভুলভাবে ভারতের ইতিহাস প্রনয়ণ করিতে অন্যের পক্ষে বহু বৎসরের প্রয়োজন হইবে।' এই বিপুল জ্ঞানশালী ব্যক্তি প্রায় বর্ত্তমানের ন্যায় সমালোচনা-শক্তির অধিকারী ছিলেন।* তাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদের তথা-কথিত নব্য-জ্ঞান প্রতিভার ন্যায় পুরাতন বলিয়াই মনে হয়।§ আন্‌সারীর পূর্ব্বে এশিয়ায় আর কেহই কেবল কবিত্ব-প্রতিভার জন্য এত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নাই।† আসাদী মুনাদারা বা সামরিক কবিতার আবিষ্কর্ত্তা না হইলেও তাঁহার হস্তে যে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। ফেরদৌসী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। ‡ তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত মহাকাব্য শাহ্‌নামা তাঁহাকে মর-জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সোলতান মাহ্‌মুদ ও ফেরদৌসী সম্বন্ধে বাজারে যে গল্প প্রচলিত আছে, প্রত্যেকেই তাহার সহিত সুপরিচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মজাদার কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তুসের শাসন-কর্ত্তার জুলুমে অতিষ্ঠ

---

* Browne, ii, 105.

§ Macdonald, Development of Muslim Theology, 197.

† Elphinstone, 334.

‡ Sir Roper Lethbridge, History of India, 36.

হইয়া ফেরদৌসীর গজনা গমন, প্রতিভা-মুগ্ধ আন্সারীর অনুগ্রহে সোলতানের সহিত পরিচয়, দাকিকির অসমাপ্ত শাহ্নামা রচনার ভারগ্রহণ, স্বর্ণ-মুদ্রার প্রতিশ্রুতি, অথচ ত্রিশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর রৌপ্য-মুদ্রা প্রাপ্তি—এই সকল চমকপ্রদ কাহিনী কোন সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থেই নাই; দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে লিখিত কোন প্রাচীনতম ইতিহাসেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজামীর চাহার মাকালা (১১৫৭) ও আওফীর লুবাবুল আল্বাব (১২২৮) ফেরদৌসী সম্বন্ধে দুই খানি প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রথমটীতে ফেরদৌসী-কাহিনী আছে, কিন্তু এই গল্পটীর উল্লেখমাত্র নাই। আওফী শাহ্নামার কবির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে হামদুল্লাহ্ তারিখ-ই-গাজিদা রচনা করেন। ইলিয়ট ও ডাউসনের মতে এই গ্রন্থখানি অটল বিশ্বাসের যোগ্য। তিনি ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম ও মৃত্যুর তারিখ দিয়াছেন; কিন্তু বাজার-প্রচলিত গল্পের কোনই উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তিন শত বৎসরের মধ্যে (১০৩০-১৩৩০) এই গল্পটীর উৎপত্তি হয় নাই। অধ্যাপক নোলডেক ন্যায়তঃ ইহাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ব্রাউন সাহেব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। * লেনপুল

*"...no trace of it is to be found in the oldest accounts...and Professor Noldeke is undoubtedly right in rejecting it as purely fictitious."—Browne, iii, 181.

ও এলফিনষ্টোনও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।*

মাহ্মূদের মৃত্যুর সোয়াশ' বৎসর পরে লিখিত চাহার মাকালা ফেরদৌসী-উপাখ্যানের মূল; কিন্তু উহা বাজারের গল্প নহে। নিজামীর মতে ফেরদৌসী শাহ্নামা সমাপ্ত করিয়া আলী দায়লাম নামক এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা নকল করাইয়া গজনা গমন করেন। উজীর আহ্মদ বিন্ হাসানের মারফতে এই মহাকাব্য দেখিতে পাইয়া মাহ্মূদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু উজীরের শত্রুরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, ফেরদৌসী এক জন শিয়া ও মুতাজিলি; তাঁহাকে অর্দ্ধ-লক্ষ দেরহাম দানই যথেষ্ট। কাজেই সোলতান তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশ (এক খানা অনুলিপিতে আছে ষাট) হাজার দেরহাম দিয়াই বিদায় দেন। অসন্তুষ্ট কবি ঐ টাকা হাম্মামের প্রহরী ও সরবৎ-বিক্রেতাকে বিলাইয়া দিয়া ছয় মাস হেরাতে লুকাইয়া থাকেন; তৎপরে বাড়ী ঘুরিয়া তাবারিস্তানে গিয়া সোলতানের নামে দুই শত ছত্র ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তথাকার রাজা তাহা এক লক্ষ দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন; দশটী ছত্র মাত্র কোনরূপে থাকিয়া যায়। কিছু দিন পরে মাহ্মূদ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ফেরদৌসীকে ষাট হাজার দিনার মূল্যের নীল পাঠাইয়া দেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা তুসে পৌঁছার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই কবির মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা ঐ অর্থ গ্রহণ না করায় তদ্দ্বারা চাহার বিশ্রামাগারের সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তুসের

* Elphinstone, 335; Lane-poole, 39.

জনৈক আলেম শিয়া বলিয়া সুন্নীদের কবরস্থানে ফেরদৌসীর শব সমাহিত করিতে দেন নাই ; তজ্জন্য মাহ্ম্দ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

নিজামীর বর্ণনানুসারে সোলতান কর্ত্তৃক ষষ্টি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতিতে ফেরদৌসীকে শাহ্নামা রচনায় নিয়োগের কথা মিথ্যা। তিনি পূর্ব্বেই উহা রচনা করিয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণ মাহ্মূদকে দেখাইবার জন্য গজনায় লইয়া যান। একটু তলাইয়া দেখিলেই গল্পটীর ভিত্তি-মূল ধ্বসিয়া পড়ে। ১০১০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ বিন্ হাসান সোলতানের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার সহিত ফেরদৌসীর পরিচয় হইতে পারে না। যদি সে বৎসরই তিনি শাহ্নামা রচনার ভার পান এবং উহাতে যদি ত্রিশ বৎসর লাগিয়া থাকে, তবে ১০৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই এই মহাকাব্য শেষ হইতে পারে না! অথচ ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে মাহ্মূদের ও অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব্বে ফেরদৌসীর মৃত্যু হয়!! কাজেই ফেরদৌসীও গজনায় বসিয়া শাহ্নামা সমাপ্ত করিতে পারেন না, মাহমুদের পক্ষেও তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। সোলতানের প্রতি গল্প-লেখকদের মেহেরবানী কত! তাঁহারা ফেরদৌসী ও মাহ্মুদের অস্থিগুলিকে পর্য্যন্ত কবর হইতে টানিয়া উঠাইয়াছেন!! নচেৎ আসর জমিবে কেন?

চাহার মাকালা ও তারিখ-ই-গাজিদার বিবরণ এবং ডাক্তার এথি (Dr. Ethe) ও অধ্যাপক নোলডেকের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া ব্রাউন সাহেব স্থির করিয়াছেন, ৯২০ খৃষ্টাব্দ বা

তাহার সামান্য পরে ফেরদৌসীর জন্ম হয়। ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহ্‌নামা রচনা আরম্ভ করেন। পঁচিশ বৎসর পরিশ্রমের পর ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত হয়। প্রথম সংস্করণ কবি আহ্‌মদ বিন্ মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে উৎসর্গ করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ মাহ্‌মুদকে উৎসর্গীকৃত হয়। গজনা ত্যাগের পর তিনি তাঁহার অন্যতম মহাকাব্য ইউসুফ জোলায়খা রচনা করেন। ১০২০ বা ১০২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।*

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ফেরদৌসী যখন শাহ্‌নামা রচনা আরম্ভ করেন, তখন মাহ্‌মুদের জন্মই হয় নাই। কাজেই তাঁহার হুকুমে গজনায় থাকিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ফেরদৌসীর কাব্য রচনার কথা নিছক গাঁজাখোরী গল্প। ইহা দৌলত শাহের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। মহামতি সোলতানের মৃত্যুর সাড়ে চারি শত বৎসরের অধিক কাল পরে (১৪৮৭) লিখিত তাজকেরাতুশ্‌ শুয়ারায় সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজামীর ফেরদৌসী-কাহিনীর শেষাংশের মর্ম্ম অনেকটা অবিকৃত রাখিয়া তিনি ইহার ঐতিহাসিক ভাগ সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু শাহ্‌ সাহেবও স্বর্ণ-মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করেন নাই। খোন্দামিরের হাবীবুশ্‌ শিয়ারেও (১৫৩৪) এই অঙ্গীকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।†

---

* Browne, ii, 141.

† বিস্তৃত বিবরণের জন্য মোস্‌লেম-কীর্ত্তি, ৩য় খণ্ড, ২০-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে লিখিত কোন গ্রন্থেই তাঁহার মোহর দানের প্রতিশ্রুতির আভাস-মাত্র নাই। ইহা ফিরিশ্‌তা (১৬০৬) প্রভৃতি আরও পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিকগণের সৃষ্টি।

গল্পটীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও কি মাহ্‌মুদের সদাশয়তার লাঘব হয়? লেনপুল বলেন, এক খানা কাব্য লেখার (প্রকৃতপক্ষে উৎসর্গ করার) জন্য ষাট হাজার টাকা দান সামান্য কথা নহে। উহা প্রায় আড়াই হাজার পাউণ্ডের সমান। বর্ত্তমান সময় এই টাকায় এক লাইব্রেরী কাব্য লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে। 'প্যারাডাইজ্‌ লষ্টে'র কবিকে মাত্র দশ পাউণ্ড পারিশ্রমিক পাইয়াই তৃপ্ত হইতে হইয়াছিল। ঘৃণাভরে প্রভু-দত্ত বিপুল অর্থ ভৃত্যদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া ব্যঙ্গ-কবিতা লেখাই কি এই সদাশয়তার উপযুক্ত পুরস্কার? প্রকৃতপক্ষে গল্পটীতে মাহ্‌মুদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রকৃত চিত্র নহে। মহাপ্রাণ ভূপতি যে অবশেষে এই অপমান ক্ষমা করিয়া ক্ষুব্ধ কবির ক্রোধ শান্তির জন্য পঞ্চাশ হাজার গিনি উপহার প্রেরণ করেন, তাহা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব প্রতিভাত হয়।*

---

* "The notable part of the story is, not that the poet indignantly spurned the gift,...and then rewarded Mahmud's kindness and support by a scathing satire...but that the great Sultan at last forgave the insult and sent a second lavish gift..." —Lane-poole, 31.

এলফিনষ্টোনের মতেও এই ব্যঙ্গ-কবিতা ভুলিয়া গিয়া আশাতীত অর্থ প্রেরণই মাহ্‌মুদের মহানুভবতার প্রমাণ।*

অধ্যাপক হবীব ও ডাক্তার নিজামের গ্রন্থই মাহ্‌মুদের একমাত্র জীবন-চরিত। প্রথম খানা প্রধানতঃ ইলিয়ট ও ডাউসনের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। দ্বিতীয় খানার গবেষণার কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। অথচ ডাক্তার সাহেবও এই গল্পটীর ঐতিহাসিকতা লইয়া আলোচনা করা দরকার মনে করেন নাই। 'ফেরদৌসী-উপাখ্যানের সত্যতা যাহাই হউক' বলিয়া হবীব যেখানে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, "ফেরদৌসী সম্ভবতঃ সোলতানের অনুরোধে তাঁহার অমর শাহ্‌নামার এক বৃহদংশ গজনার দরবারে রচনা করেন।" তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটী কথার জন্য তিনি প্রামাণিক গ্রন্থের বরাত দিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোনই প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই! এই উপেক্ষার কারণ বুঝা দুষ্কর।

কাব্যের ন্যায় ইতিহাসের গতি নিরঙ্কুশ নহে। কবি হইয়াও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া 'ফেরদৌসী-চরিত'-লেখক বাঙ্গালায় সোলতান মাহ্‌মুদের কুৎসা প্রচারে যত সহায়তা করিয়াছেন,

---

* "...Mahmud magnanimously forgot the satire, while he remembered the great epic, and sent so ample a remuneration to the poet as would have surpassed his highest expectation."

—Elphinstone, 335.

আর কেহই তত করেন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইংরেজীনবীশ হইয়াও 'পারস্য প্রতিভা'র গ্রন্থকার এই গতানুগতিকতার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। হবীব বলেন, 'ধর্ম্মান্ধ মোসলমানেরাই বরাবর ইস্‌লামের ভীষণতম শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে।' কথাটা সত্য। কিন্তু ইস্‌লামের আর এক শ্রেণীর ভীষণতর শত্রু আছে; তাঁহারা হইতেছেন, অন্ধ অনুকরণকারীর দল। ইতিহাস লিখিবার খেয়াল ইহাদের যত কম হয়, ইস্‌লামের ততই মঙ্গল। *

---

* 'ফেরদৌসী-চরিত' ও 'পারস্য-প্রতিভা' দুই খানা পুস্তকই ঢাকা বোর্ডের পাঠ্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও উভয় গ্রন্থ হইতে ফেরদৌসী-কাহিনীটীকেই চয়ন করিয়া 'মেট্রিক সিলেক্‌শানে' স্থান দিয়াছেন। বোর্ড ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্ব্বাচন-কমিটীতে ত দেশী-বিদেশী পি-এচ্চ্-ডি ও ডি-লিট্ এর অভাব নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ফেরদৌসী-উপাখ্যানের অনৈতিহাসিকতা তাঁহাদের চক্ষে ধরা পড়িল না কেন? ব্রাউনের 'ফারসী সাহিত্যের ইতিহাস' খানাও কি তাঁহাদের নজরে পড়ে নাই? মাহ্‌মুদ সত্যই দুর্ভাগ্য। তাঁহার পক্ষে মক্কা, কাশী দুইই সমান।

মহামতি মাহ্মুদ

কথা আছে, "মাছি শুধু ঘা খুঁজিয়াই বেড়ায়।" স্থূলদর্শী ঐতিহাসিকেরাও মাহ্মুদের দোষ ছাড়া কোন গুণ দেখিতে পান না। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে তাঁহার চরিত্রের নানা দিক্ বিস্তৃত-রূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের অনেক অহেতুক অভিযোগের উত্তর রহিয়াছে। সৌভাগ্য বশতঃ নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক কোন সমাজেই একেবারে বিরল নহেন। কেহ কেহ মাহ্মুদের প্রতি বাস্তবিকই অনেকটা সুবিচার করিয়াছেন।

মিঃ নাজিম সোলতান মাহ্মুদ সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ (thesis) রচনা করিয়া ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি-এচ্-ডি (Ph. D) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ হিসাবে মাহ্মূদ শুদ্ধচিত্ত, স্নেহবান, ধার্ম্মিক, দয়ালু, খোদাভক্ত, সদাশয় ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র বাস্তবিকই উন্নত ও প্রশংসনীয়। তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে কখনও তাঁহাকে পরাজয়ের অপমান ঘাড়ে লইতে হয় নাই। প্রাচ্য-লেখকেরা তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; এই প্রশংসা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। ফারসী সাহিত্যের গঠন ও শ্রীবৃদ্ধি তাঁহারই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের ফল। শাসক হিসাবে তাঁহার নাম সসম্মানে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য।

যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে বারংবার স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলেও তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কেবল বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই তিনি ব্যর্থকাম হন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য-সীমা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়া যান যে, এক জনের পক্ষে তাহা শাসন করা সম্ভবপর ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মাহ্‌মূদ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও বিজেতাদের অন্যতম। শাহ্‌জাদা মস্‌উদের ভাষায়, কোন জননী মাহ্‌মূদের ন্যায় সন্তান আর গর্ভে ধারণ করিবেন না।"

ডাক্তার ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "ইতিহাসে মাহ্‌মূদের স্থান নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। সমসাময়িক মোসলমানেরা তাঁহাকে গাজী ও ইস্‌লামের নেতা বলিয়া জানিতেন। হিন্দুরা অদ্যাপি তাঁহাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, আদি হুন এবং মন্দির ও মূর্ত্তি ভগ্নকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সে যুগের বিশেষ অবস্থার খবর রাখেন, তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে মাহ্‌মূদ এক জন শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক, ন্যায়-পরায়ণ ভূপতি, সাহসী ও প্রতিভাশালী সেনাপতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ও শিল্পকলার উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার মতে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতিদের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হওয়ার যোগ্য।"*

---

*"But the unbiassed historian who keeps in mind the peculiar circumstances of the age, must reeord a differeut verdict. In his estimate Mahmud was a great leader of men, a just and upright ruler... and deserves to be ranked among the greatest kings of the world."—Mediaeval India, 191.

মার্শম্যান সাহেব বলেন,"মাহ্‌মুদ কেবল সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী নহেন, সর্ব্বপ্রধান নরপতিও বটে। আরব সাগর হইতে পারস্যোপসাগর ও কর্দ্দিস্তানের পর্ব্বতমালা হইতে শতদ্রু-তীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই বিশাল ভূভাগে যেরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল, তাহাই তাঁহার শাসন-প্রতিভার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। এশিয়ায় তাঁহার দরবারই সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরময় ছিল; বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতায় কখনও কোন রাজা তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।···এশিয়ার অপর কোন রাজার দরবারে কখনও এত অধিক প্রতিভাশালী বিদ্বান ব্যক্তি সমবেত হন নাই।"*

ভারতীয় স্থাপত্য-বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেল স্যার জন মার্শাল বলেন, "নবম ও দশম শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব পারস্যের সামানিয়া বংশ যে সভ্যতা ও আড়ম্বরের অধিকারী ছিলেন, তাহা

* "Mahmood was not only the greatest conqueror, but the grandest sovereign of the age...the order which reigned through the vast territories gave abundant proof of his genius for civil administration. His court was the most magnificient in Asia and few princes have ever surpassed him in the munificent encouragement of letters···his capital was adorned with a greater assemblage of literary genius than any other monarch in Asia has ever been able to collect."—Abridgement of the history of India, 22.

যেন উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে গজনভীদের হস্তগত হয়। মহামতি মাহ্‌মুদ ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সোলতানদের আমলে স্থাপত্যের আড়ম্বরে গজনি খেলাফতের সমস্ত নগরের মধ্যে বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়।"*

স্যার জন মার্শালের বহুপূর্ব্বে ফার্গুশন সাহেবও সোলতান মাহ্‌মুদকে the Great বা মহামতি উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।† তিনি যে বাস্তবিকই এই গৌরবের যোগ্য পাত্র, নিরপেক্ষ লোক মাত্রই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

* "...under Mahmud the Great and his immediate successors, Gazni became famous among all the cities of the Caliphate for the splendours of its architecture."—Cambridge History of India, iii, 574.

† "the Great Mahmud."—Indian and Eastern Architecture, 496 (edition of 1876).